৭ মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতিক মতাদর্শ [Political Ideas of Mahatma Gandhi]

অধ্যায়সূচী

[১] ভূমিকা [২] গান্ধীজির চিন্তাধারার উৎস [৩] গান্ধীজির চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ : (ক) অধিবিদ্যামূলক আদর্শবাদ এবং নৈর্ব্যক্তিক সত্য, (খ) গান্ধীজির অহিংসা নীতি (গ) গান্ধীজির সত্যাগ্রহ নীতি, (ঘ) রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা, (ঙ) রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, (চ) স্বরাজ সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণা, (ছ) আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কিত গান্ধীজির ধারণা, (জ) গান্ধীজির নৈরাজ্যবাদী ধারণা, (ঝ) সর্বোদয় সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণা, (ঞ) অছি-ব্যবস্থা সম্পর্কিত গান্ধীজির ধারণা, (ট) ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণা [৪] গান্ধী : সাম্প্রতিক তাৎপর্য

৭.১ ভূমিকা (Introduction)

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন বিশ্বনাগরিক, তথা বিশ্ববিবেক। তিনি ছিলেন সর্বকালের একজন বিশিষ্ট মানবতাবাদী। আধুনিককালে ভারত আরও মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব বিশ্বকে উপহার দিয়েছে। এঁদের মধ্যে গান্ধীজিই নিজগুণে বিশিষ্ট। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে কয় বড়মাপের মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এঁদের অনেকেই সমকালীন বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর উপর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম করেছেন। কিন্তু মানবজাতির চিন্তা ও কর্মের উপর গান্ধীজির মত কেউই প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। মহাত্মার মতাদর্শ ও কাজকর্ম সমগ্র মানবজাতিকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি এমনই এক মাপের মানুষ ছিলেন যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বুদ্ধ ও খ্রীস্টের সঙ্গে তাঁর কথা বলবে। কার্ল হিথ (Carl Heath) তাঁর *Apostle of Life and Truth Force* শীর্ষক গ্রন্থে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিতভাবে বলেছেন : "...the type of the civilized and humanized man."

বিশ্ববিবেক গান্ধীজি

আনুষ্ঠানিক অর্থে গান্ধীজিকে রাষ্ট্রদার্শনিক বলা যায় না। তিনি কোন সুসম্বদ্ধ রাষ্ট্রনীতিক দর্শনের অবতারণা করেন নি। দূরকল্যাণমূলক কোন রাজনীতিক দর্শন তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। গান্ধী নিজেই এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে বলছেন যে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন তা সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থবহ। আবার কিছুটা খাপছাড়া তাই তাঁর বক্তব্যের নানা ব্যাখ্যা হতে পারে। বস্তুত সে অর্থে গান্ধীবাদ বলে কিছু নেই। এ হল জীবনযাপনের এক পদ্ধতি। এ হল মানবজীবন সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, এক নতুন জীবনদর্শন। জীবনধারার বিভিন্ন বিষয়ে সনাতন মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ন। মহাত্মা গান্ধীর জীবনদর্শন থেকে আধুনিক সমস্যাসমূহের পুরাতন সমাধানসূত্র পাওয়া যায়। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু মহাত্মার সমগ্র জীবনটিই হল একটি সুসম্বদ্ধ দর্শন। ভারতীয় দর্শন হল প্রথমতঃ একটি জীবনধারা এবং অতঃপর একটি চিন্তাধারা। ভারতীয় দর্শনের এই মূল তত্ত্বের অর্থবহ অভিব্যক্তি ঘটেছে মহাত্মা গান্ধীর জীবনধারায়। মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবন দিয়ে ভারতীয় দর্শনের এই মূল কথার পরিকল্পনা ও প্রয়োগকে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর জীবনে তত্ত্ব ও বাস্তবের এক বিরল সমাবেশ ঘটেছে। অধ্যাপক ড. বালি (Dev Raj Bali) তাঁর *Modern Indian Thought* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন : "He (Gandhi) was a practical idealist so to speak."

তত্ত্ব ও বাস্তবের সমাবেশ

এই বিশ্বসংসারে অশুভ শক্তির অস্তিত্ব ও তার ক্রিয়াকলাপ অনস্বীকার্য। গান্ধীজি সব রকম অশুভ শক্তিকে দুনিয়া থেকে দূর করতে সংগ্রাম করেছেন। পৃথিবীতে মানুষে-মানুষে অসাম্য-বৈষম্য ও অন্যায়-অবিচার আছে। এ সবের অবসানের ব্যাপারে গান্ধীজি সর্বপ্রকারে সচেষ্ট হয়েছেন। বস্তুত মহাত্মা গান্ধী এ সব বিষয়ে 'সত্য'কে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। নিজের জীবনধারায় তিনি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতিকে কলুষতামুক্ত করা, মানুষের মধ্যে সদ্ভাব-সম্প্রীতি সঞ্চারিত করা, মানুষের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করা এবং মানুষের শ্রমের মর্যাদার শিক্ষা প্রদান করা। ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজি ছিলেন নম্র-ভদ্র, সহজ-সরল ও সন্ন্যাসীসুলভ। নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতিকার ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারে গান্ধীজির আন্তরিক উদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজি সব সময় নিজেকে সমগ্র বিশ্বের নাগরিক হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতি ও ভারতীয় রাজনীতি ছিল তাঁর পরীক্ষাগার। এই পরীক্ষাগারে

তিনি সত্য অহিংসার বিভিন্ন উপায়-পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। মানবিকতার কাঠামোর উপর যখন নানা দিক থেকে আদিম-অসভ্য ও বর্বর আক্রমণ শাণিত হচ্ছে, মানুষ যখন ধ্বংসলীলার উন্মাদনায় উন্মত্ত, দ্রুত অবক্ষয়ের পরিণামে মানবিক মূল্যবোধ যখন তলানিতে ঠেকেছে, সেই রকম এক সময়ে বলিষ্ঠ মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ও বিস্তারের জন্য মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগ-আয়োজন নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন জাতির জনক, এক বিশাল মাপের জননেতা। এতদ্‌সত্ত্বেও রাষ্ট্রনেতা, কূটনীতিবিদ, শাসক বা পদস্থ সরকারী আধিকারিকদের সঙ্গে সংযোগ-সম্পর্ক সাধ্যমত এড়িয়ে চলতেন। গান্ধীজি অসুস্থ, দুস্থ ও দুর্বলদের ঈশ্বরের অবহেলিত সন্তান জ্ঞান করতেন। এবং এদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে তিনি ভালবাসতেন। জননেতা হিসাবে গান্ধীজির কর্তৃত্ব ছিল অনন্যসাধারণ তথা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন। কারণ তাঁর কর্তৃত্ব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক নিয়ম-নীতির প্রতি অবিচলিত আনুগত্য তাঁকে নেতৃত্বের উচ্চস্তরে উন্নীত করেছিল। সত্যের পথে তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপ তাঁকে অবিসংবাদিত জননেতায় পরিণত করেছিল। দৈহিক বল বা জাগতিক শক্তি নয়, ন্যায় ও সত্যের শক্তি গান্ধীজিকে শক্তিমান করেছিল। মহাত্মা গান্ধীর প্রশস্তি প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভর্মা (V. P. Varma) মন্তব্য করেছেন ঃ "In an age full of sickening horror and secrecy and espionage carried to perfection, the gospel of truth and creative non-violence as advocated by Gandhi sounds archistic but at the same time it is a terribly tragic commentary on the transfer of the loyalty of the modern man from Buddha, Mahavira and Christ to Lamarck, Darwin and Haeckel. Gandhi appears as another Plato and Cicero vindicating the cause of the spritiual and moral approach to political problems."

অনন্যসাধারণ কর্তৃত্ব

জীবন ও কর্ম (Life and Work)

পুরোনাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর। পশ্চিম ভারতের একটি ছোট রাজ্য পোরবন্দরে তাঁর জন্ম হয়। বিত্তবান পরিবারেই তাঁর জন্ম হয়। বাবা কাবা গান্ধী রাজকোটের কাথিয়াওয়াড় স্টেটের প্রধানমন্ত্রী হন। সাত বছর বয়সে মোহনদাসকে কাথিয়াওয়াড়ে নিয়ে আসা হয়। ধর্মীয় পরিবেশে তিনি মানুষ হন। পরিবেশের প্রভাবে অল্প বয়সেই তিনি হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীস্টধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের মৌলিক বিষয়াদির সঙ্গে পরিচিত হন। গান্ধীজির পরবর্তী কর্মময় জীবনের উপর এর প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আইন শিক্ষার জন্য মোহনদাস ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দেন। তখন তাঁর বয়স উনিশ। শিক্ষান্তে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আইনজীবী হিসাবে তিনি রাজকোটে কর্মজীবন শুরু করেন। তারপর মুম্বাই (বোম্বাই)-তে চলে যান। আইনজীবীর কর্মসূত্রেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি রাজনীতিক সংগ্রামে সামিল হন। ১৮৯৩ থেকে ১৯১৪ সাল অবধি দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান কালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজি জাতি ও বর্ণগত সাম্যের জন্য কাজ করেন। গান্ধীজির এই ভূমিকা পৃথিবীর সংগ্রামী চেতনার কাছে এক নতুন পথের সন্ধান দেয়। গান্ধীজির এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের দুর্দশা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এ কথা ঠিক। কিন্তু এই আন্দোলন নিছক কোন জাতীয়তামূলক সংকীর্ণ আন্দোলন ছিল না। 'সকল মানুষ স্বাধীন ও সমান'—এই অমূল্য সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভর্মা মন্তব্য করেছেন ঃ "It was a fight for the deep truth that all men are free and equal, and it was this message which made C. F. Andrews, one of the greatest Christians of this century, the devoted follower of the Mahatama since the days of the South African Satyagraha movement." দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনই হল রাজনীতিক ক্ষেত্রে অহিংস আন্দোলনের প্রথম প্রয়োগ। রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অহিংস সত্যাগ্রহের সফল প্রয়োগের মধ্যেই গান্ধীজির নেতৃত্বের অভিনব বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সফল গান্ধীজি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯১৫ সালের ৯ই জানুয়ারী। অতঃপর তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দেন। ভারত ও ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য ১৯১৫ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত গান্ধীজি অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করে গেছেন। তবে গান্ধীজিকে ভারতের স্বাধীনতার স্থপতি বললে সব বলা হয় না। এটা ঠিক যে তিনি হলেন বিশ্ববন্দিত দেশপ্রেমিকদের মধ্যে একজন। দেশপ্রেমিক হিসাবে তাঁর জায়গা জর্জ ওয়াশিংটন, ম্যাৎসিনি ও সান-ইয়াৎ-সেন-এর সারিতে।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কার্যাবলী ও কৃতিত্বকে ভারত ও ভারতবাসীর জন্য স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। গান্ধীজি রাজনীতির ক্ষেত্রে এক পরিশুদ্ধ পরিবেশে গড়ে তোলার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সর্বকালের মহান মানবতার চেতনাকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগ-আয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু নিষ্কলুষ স্বচ্ছ রাজনীতিক বাতাবরণ সৃষ্টির আন্দোলনে গান্ধীজির সঙ্গীর সংখ্যা কি রকম ছিল, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে এবং উঠেছে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ গান্ধীজি একাই ছিলেন অসংখ্য। সত্য ও অহিংসার প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা অনুরাগ অবিস্মরণীয়। দাঙ্গাবিধ্বস্ত বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বাংলার নোয়াখালিতে তাঁর একক পদযাত্রা সত্য ও অহিংসার জন্য তাঁর উৎসর্গীকৃত প্রাণের পরিচয়। মহাত্মা গান্ধীর সত্যনিষ্ঠা ও অহিংসা ও অবিচলিত আত্মপ্রত্যয়ের পিছনে ছিল ভাগবৎগীতা ও অন্যান্য মানবতাবাদী ধর্মশাস্ত্রসমূহের এক মৌলিক শিক্ষা। এই মৌলিক শিক্ষার মূল কথা হল ঃ 'মিথ্যাচারের পাহাড়ের থেকে সত্যের বালুকণা অনেক বেশী শক্তিশালী।' সত্য ও অহিংসার জন্য তিনি সব সময় দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "I belong to the tribe of Columbus and Stevenson who hoped against hope in the face of heaviest odds." গান্ধীজি আরও বলেছেন ঃ "I have often said if there is one true Satyagrahi it would be enough. I am trying to be that true satyagrahi."

গণমাধ্যমসমূহের চিল-চিৎকারের প্রতি তিনি ছিলেন বধির। কিন্তু মানবাত্মার অনুক্ত আবেদনের প্রতি তিনি ছিলেন অনন্যমনা। সত্যের জন্য সংগ্রামে তিনি ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ। আধ্যাত্মিক চেতনা সূত্রে তিনি প্রশান্ত মন ও অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র জীবনব্যাপী ভাগবৎগীতার মর্মবাণীর উজ্জ্বল অভিব্যক্তি ঘটেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের আগে সুদীর্ঘ প্রায় চৌদ্দ বছর তিনি এ দেশে অনুপস্থিত ছিলেন। এই কারণে দেশে ফিরে প্রায় বছর খানেক ধরে তিনি মাতৃভূমির এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পরিভ্রমণ করেন। দেশবাসীর হৃদয়ে-মনে ইতিমধ্যেই তাঁর মর্যাদামণ্ডিত আসন পাকা হয়ে গেছল। এবার তিনি সমগ্র দেশের সকল অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হলেন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আধ্যাত্মিকতা, মূল্যবোধ-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা প্রভৃতির সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হলেন। স্বদেশ ও স্বজনের সঙ্গে গান্ধীজির আত্মিক সংযোগ-সম্পর্ক স্থাপিত হল। জনসাধারণের মনের ভাষাকে তিনি বাঙ্ময় রূপ দিতে শুরু করলেন। ভারতের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে এই সংযোগ-সম্পর্ক গান্ধীজিকে যথার্থ জননায়কে পরিণত করল। দেশের আমজনতাই তাঁকে মহাত্মা উপাধিতে ভূষিত করল।

সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে মহাত্মা গান্ধী ভারত ও ভারতীয়দের জন্য এক সংগ্রামী ও কর্মবহুল জীবন পরিচালনা করেছেন। দেশ ও দেশবাসীর জন্য তাঁর আত্মত্যাগ অনন্যসাধারণ। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তিনি বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। 'অহিংস' ও 'সত্যাগ্রহ' সংগ্রামের এই দুটি হাতিয়ারকে নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। কারাবরণ করেছেন বহুবার। প্রতীক ও আমৃত্যু আনশন করেছেন অনেকবার। দেশের অবহেলিত অস্পৃশ্য, অভাজন ছিল তাঁর 'হরিজন'। তাদের জন্য তিনি ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এই মহামানবের জীবনের অবসান ঘটেছে এক আততায়ীর গুলিতে ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারী তারিখে। এই মহাত্মার ভূমিকার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. ভর্মা মন্তব্য করেছেন ঃ "His stand on truth and the persistent resolute attempt at the crystallization of the perfectionistic dreams of humanity in his own person and in society impart to him a place all unique and beyond the grasp of a parochial patriot or power politician."

৭.২ গান্ধীজির চিন্তাধারার উৎস (Sources of Gandhi's Thought)

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক দার্শনিক ছিলেন না। প্লেটো-এ্যারিস্টটল, মিল-বেন্থাম প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌দের যে অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলা হয়, গান্ধীজিকে তা বলা যায় না। রাজনৈতিক তত্ত্ব বা দর্শন প্রচার বা প্রতিষ্ঠার কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। বিশেষ ঘটনা প্রবাহে আকস্মিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি ছিলেন প্রকৃতিগতভাবে মানবতাবাদী ও ধর্মপ্রাণ। জীবন সম্পর্কে তিনি এক গভীর নৈতিক সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। কর্মযোগ এবং নীতিনিয়মের আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা মানবজীবনকে পরিচালিত করে তিনি এক উন্নত সমাজব্যবস্থা গঠন করতে চেয়েছিলেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপ প্রসঙ্গে গান্ধীজির সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা বা ধ্যান-ধারণা ছিল। এরই ভিত্তিতে তাঁর অনুগামীরা 'গান্ধীবাদ' নামে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে গান্ধীবাদ (Gandhism) হিসাবে কোন সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দর্শন নেই। এ ব্যাপারে গান্ধীজির নিজের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ 'গান্ধীবাদ বলে কিছু নেই

.....নতুন কোন নীতি বা মতবাদের স্রষ্টা হিসাবে আমি কিছু দাবি করি না। প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাদির ক্ষেত্রে আমি কেবল শাশ্বত সত্যকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছি। একে গান্ধীবাদ বলা যায় না। এর মধ্যে কোন মতবাদ নেই' "There is no such thing as 'Gandhism' and I do not want to leave any doctrine after me. I do not claim to have propounded any new principle or doctrine. I have simply tried in my own way to apply the basic truths to our daily life and problems. The opinions I have formed and the conclusions I have tried to arrive at are not final. I may change them tomorrow. I have nothing to teach to the world. Truth and non-violence are as old as the hills. All I have done is to make experiments in both of them on as vast a scale as was possible for me to make. In doing this, I have sometimes erred and learnt by my error well, all my philosophy if it may be called by that pretentious name, is contained in what I have said you will not call it 'Gandhism', there is no ism about it."

গান্ধীবাদ কোন রাজনৈতিক মতবাদ নয়

মহাত্মা গান্ধী হলেন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সন্তান। তাঁর উপর প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রবল প্রভাব পড়েছে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ হল বহু মুনি-ঋষির জন্মস্থান। তাঁরা মানুষকে সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। ভারতের এই সন্ন্যাসীসুলভ ঐতিহ্যের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সংযোগ-সম্পর্ক ছিল।

গান্ধীজির সমগ্র চিন্তা ও কর্ম তাঁর ধর্মীয় চিন্তা ও মানবতাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। তাই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার উৎস সন্ধানের ক্ষেত্রে প্রথমেই বেদ, ভাগবত গীতা, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতির কথা বলতে হয়। মহাত্মার মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গীতার বাণী বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ফলের আশা না করে কাজ করে যাওয়ার শিক্ষা তিনি গীতা থেকে পেয়েছেন। গীতার বাণী জীবনের সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় গান্ধীজিকে সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়েছে। গীতার 'কর্মযোগ' তাঁকে 'কর্মযোগী' করেছে। তিনি বলেছেন : "When doubts haunt me, when disappointments stare me in the face, I turn to Bhagwad Gita and find in it a verse to comfort me : I owe it to the teachings of Bhagwad Gita."

ভগবত গীতা এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব

গান্ধীজির চিন্তা ও কর্মের মূল প্রেরণা হিসাবে অহিংসার কথা বলা হয়। এর মূল কারণ হল তিনি বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। গান্ধীজি ছিলেন বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতামাতা ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব। তাঁর উপর জৈন সাধু বেচারজি স্বামী (Becharji Swami)-র প্রভাব পড়েছে অত্যন্ত বেশী। লণ্ডন যাওয়ার আগে বেচারজি স্বামী গান্ধীজিকে দিয়ে এই মর্মে এক শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন যে, তিনি মদ, মেয়েমানুষ ও মাংস স্পর্শ করবেন না। মহাত্মা গান্ধী দৃঢ়তার সঙ্গে এই শপথ মান্য করেছিলেন। বলা হয় যে, হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষাই গান্ধীজির চিন্তা ও কর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে এই শিক্ষাকে গান্ধীজি প্রয়োগ করেছিলেন। বাইবেলের বাণীও তাঁকে প্রভাবিত করেছে। যীশুর 'সারমন্ অন্ দি মাউন্ট' এর শিক্ষা তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

ড. শশীভূষণ দাসগুপ্তের মতানুসারে টলস্টয়, রাস্কিন, থোরো, ম্যাৎসিনি, কার্পেন্টার প্রমুখ বিভিন্ন চিন্তাবিদের লেখা থেকে গান্ধীজি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। আত্মজীবনীতে গান্ধীজি স্বীকার করেছেন : "আধুনিক জগতের তিনজন আমার জীবনের উপর গভীর ছাপ অঙ্কিত করিয়াছেন। রায়চন্দ্ ভাই তাঁহার জীবন্ত সংসর্গ দ্বারা, টলস্টয় তাঁহার 'বৈকুণ্ঠ তোমার হৃদয়ে' (Kingdom of God is Within You) নামক পুস্তকের দ্বারা এবং জন রাস্কিন তাঁহার 'আনটু দিস্ লাস্ট' নামক পুস্তকের দ্বারা আমাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছেন।" জন রাস্কিন (John Ruskin)-এর Unto This Last বইটি তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। রাস্কিনের কাছ থেকে পাওয়া গান্ধীজির তিনটি মূল শিক্ষা হল : (১) সমষ্টির কল্যাণের মধ্যেই ব্যক্তির কল্যাণ বর্তমান ; (২) একজন আইনজীবী ও একজন ক্ষৌরকারের শ্রমের মূল্য সমান ; এবং (৩) শ্রমজীবীদের জীবনই হল আদর্শ জীবন। টলস্টয়ের অহিংসা নীতির দ্বারা গান্ধীজি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। টলস্টয়ের বাণী ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি অহিংস উপায়ে শাসকের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিকারের কথা বলেছেন। টলস্টয়ের 'বৈকুণ্ঠ তোমার হৃদয়ে' পুস্তকটি গান্ধীজিকে অভিভূত করেছে। তিনি 'আত্মজীবনী'-তে বলেছেন : "Tolstoy is one of the three moderners who have exerted the greatest spiritual influence on my life." মার্কিন নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক থোরো (David Thoreau)-র *An Essay on Civil Disobedience* শীর্ষক রচনাটিও গান্ধীজিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অনেকে মনে করেন

রাস্কিন, টলস্টয়, থোরো প্রমুখ মনীষীর প্রভাব

গান্ধীজি তাঁর সত্যাগ্রহের ধারণা থোরোর কাছ থেকে পেয়েছেন। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। তবে ভারতে গান্ধীজি যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন তখন থোরোর বইটির বক্তব্যর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারেন। খ্রীস্টান নৈরাজ্যবাদী টলস্টয়ের কাছ থেকে গান্ধীজি এই শিক্ষা নিয়েছিলেন যে, শান্তিপূর্ণ পথে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। গান্ধীজির রাজনৈতিক দর্শনের মৌলিক দিকগুলির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং 'Harijan', 'Young India' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে।

৭.৩ গান্ধীজির চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ (Main features of Gandhi's Thought)

মহাত্মা গান্ধী হলেন এক অতি উচ্চমার্গের জাতীয় নেতা তথা দৈবপ্রেরণাযুক্ত এক জাতীয় শিক্ষক। মানবসমাজের পুনর্গঠন ও মানবজাতির উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি মৌলিক মতাদর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এ দিক থেকে বিচার করলে গান্ধীজি ছিলেন একজন নৈতিক ও রাজনীতিক চিন্তাবিদ্।

নৈতিক ও রাজনীতিক চিন্তাবিদ

নৈতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে দেশকে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। নিজের অন্তর অনুভূত মতাদর্শসমূহ তিনি জনসাধারণকে জানিয়েছেন। তবে নিজেই তিনি বলেছেন যে মানবজাতিকে তিনি কোন নতুন মতবাদ দেন নি। এ প্রসঙ্গে আচার্য জে. বি. কৃপালিনী (J. B. Kripalani) তাঁর *Gandhian Thought* শীর্ষক রচনায় মন্তব্য করেছেন ঃ "I believe there is nothing yet like Gandhism. All 'isms' come into existence, not at the initiative of those in whose names they are preached and promulgated, but as a result of the limitations imposed upon the original ideas by the followers.....Gandhi is no philosopher. He has created no new system. He has from the beginning been a practical reformer."

তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিভিন্ন সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ ব্যক্ত করেছেন। এই সমস্ত মতাদর্শকে সামগ্রিকভাবে গান্ধীবাদ হিসাবে বিবেচনা করতে বাধা নেই। গান্ধীজি ছিলেন কর্মযোগী। তাঁকে একাধারে আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী বলা হয়। নিজের জীবনে আচরণ করে তিনি বিভিন্ন আদর্শ জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। যে সমস্ত উচ্চ ও মহান আদর্শের ভিত্তিতে তিনি অভিপ্রেত মানবসমাজের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, সেগুলি তিনি নিজের জীবনধারায় প্রয়োগ করে প্রমাণ ও প্রতিপন্ন করেছেন। মহাত্মার মৌলিক মতাদর্শসমূহের মূল ভারতের সনাতন সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত আছে। মহাত্মার মতাদর্শসমূহের অনুমোদন প্রাচীন ভারতের

আদর্শবাদী হয়েও বাস্তববাদী

মুনি-ঋষি, ধর্মশাস্ত্র ও জননায়কদের মধ্যে পাওয়া যায়। গান্ধীজির সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক মতাদর্শসমূহ মানুষকে এক সুস্পষ্ট নৈতিক জীবনের লক্ষ্যের সন্ধান দেয়, সুস্থ-সুন্দর জীবনযাপনের পথনির্দেশ করে। তা ছাড়া এই সমস্ত মতাদর্শের মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে বিবাদ-বিসংবাদ ও উত্তেজনা প্রশমনের প্রাতিষ্ঠানিক উপায়-পদ্ধতির সন্ধানও গান্ধীজির মতাদর্শের মধ্যে পাওয়া যায়। মহাত্মা গান্ধীর সামাজিক ও রাজনীতিক দর্শন তাঁর সন্ন্যাসীসুলভ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই কারণে বলা হয় যে, গান্ধীজি হলেন রাজনীতিকদের মধ্যে সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে রাজনীতিবিদ্। গান্ধীজির চিন্তাধারা ও মতাদর্শ অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক, অধিবিদ্যক ও যুক্তিবাদী। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও রাজনীতিক চিন্তার ইতিহাসে গান্ধীজি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। গান্ধীজির মতাদর্শ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এম. এস. বাচ (M. S. Buch) তাঁর *Rise and Growth of Indian Nationalism : Non-Violent Nationalism : Gandhi and his School* শীর্ষক রচনায় বলেছেন ঃ "Gandhism, like Hinduism, is a spirit,.....it is an attitude, ... it is a process of thinking and living.....Gandhi himself is an erring follower of Gandhism, a devoted wroshipper of the eternally valid, and yet eternally elusive ideals of the love of God and the love of truth....it is an age-long passion for God directing Gandhi, in ways peculiar to him, to realise him in his service of humanity and of India."

মহাত্মা গান্ধী সমকালীন পরিস্থিতির প্রয়োজনে ও তাগিদে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে তিনি কখনই এই সমস্ত মতামতকে চূড়ান্ত বলে দাবি করেন নি। বস্তুত গান্ধীজির নিজস্ব এক জীবনদর্শন ছিল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে তিনি বিশেষ কিছু নীতি ও উপায়-পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তিনি বিশেষ কিছু নীতি ও পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। সৎ

উদ্দেশ্য এবং নীতি ও উপায়

উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তিনি সৎ উপায়-পদ্ধতির অনুসরণ করার উপর জোর দিতেন। গান্ধীজির অভিমত অনুযায়ী যে-কোন উপায়ে বা পথে সৎ উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়া যায় না। মহাত্মার মতানুসারে উদ্দেশ্য ও উপায় বা লক্ষ্য ও পন্থা পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। উপায় থেকেই উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি ঘটে। ম্যাকিয়াভেলি ও মার্কস এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। এঁদের মতানুসারে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই উপায়ের যথার্থতা নির্ধারিত হয় (end justifies the means)। মহাত্মা গান্ধী এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতানুসারে উপায়ের উপর উদ্দেশ্যের গুণাগুণ নির্ভরশীল (as means so the end)। *হিন্দ স্বরাজ* শীর্ষক রচনায় গান্ধীজি বলেছেন ঃ "The means may be likened to a seed, the end to a tree, and there is just the same inviolable connection between the means and the end as there is between the seed and the tree."

জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি যে সমস্ত নীতি অনুসরণ করতেন, সেগুলি হল ঃ সত্য, অহিংসা, সামাজিক সাম্য, সর্ব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ঔপনিবেশিকতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও যে-কোন ধরনের শোষণের বিরোধিতা। গান্ধীজি যে সমস্ত উপায়-পদ্ধতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন, সেগুলি হল ঃ সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, প্রতীকী ও আমরণ অনশন, হরতাল প্রভৃতি। বস্তুত মহাত্মা গান্ধীর মতাদর্শে 'লক্ষ্য ও পন্থার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রিচার্ড গ্রেগ (Richard B. Gregg) তাঁর *Which Way Lies Hope* শীর্ষক রচনায় বলেছেন ঃ "Ends which are sought in human affairs are matters of growth and inevitably absorb and embody the means which are used to produce them, just as a plant absorbs water, minerals and the energy of the sunshine which are the means of its growth." এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে গান্ধীর রাজনৈতিক মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ্‌দের অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং মৌলিক। গান্ধী রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে যে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সমালোচনা করেন পার্থ চ্যাটার্জীর মতে, তা অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধীর সমসাময়িক অন্যান্য জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদেরা বড়জোর পশ্চিমী গরিমা এবং অতি জাতীয়তাবাদী ঔপনিবেশিক অভীপ্সার বাড়াবাড়িকে সমালোচনা করেছেন, তার বিরোধিতা করেছেন। পার্থ চ্যাটার্জীর অভিমত গান্ধী ব্যতীত অন্যান্য তাত্ত্বিকদের অধিকাংশই পশ্চিমী দুনিয়া নির্মিত 'প্রাচ্যবাদী' জ্ঞান কাঠামোতেই অধিষ্ঠান করেন এবং বিদেশী শাসনের বিরোধিতায় সামিল হন। তবে তাঁরা এখানে সক্রিয় সমালোচক। ব্রিটিশশাসনের তাঁরা অপসারণ করতে উদ্যত। কিন্তু পশ্চিমের বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদরা কিন্তু তাঁদের যাবতীয় দৃষ্টভঙ্গি গড়ে তোলেন পশ্চিমী এনলাইটেনমেন্টজাত যুক্তিবাদকে উপজীব্য করেই, এর বাইরে নয়। প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিপুষ্ট এই চিন্তাধারায় মৌলিকত্বের কোন পরিসর থাকে না। একমাত্র গান্ধীর মত ব্যক্তিত্বের মধ্যে পাওয়া যায় পশ্চিমী যুক্তিবাদী নাগরিক সমাজের মৌলিক সমালোচনা।

গান্ধীজির চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক বর্তমান। চিন্তাধারার এই সমস্ত দিক সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। তা হলে মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া সম্ভব হবে।

৭.৩.ক অধিবিদ্যামূলক আদর্শবাদ এবং নৈর্ব্যক্তিক সত্য (Metaphysical Idealism and Impersonal Truth)

মহাত্মা গান্ধী অধিবিদ্যক আদর্শবাদ গ্রহণ করেছিলেন এবং তদনুসারে তিনি তাঁর সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করেছেন। গান্ধীজি এক গভীর আধ্যাত্মিক অস্তিত্বে আস্থাশীল ও বিশ্বাসী ছিলেন। এই আস্থা ও বিশ্বাস পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। মহাত্মার মা ছিলেন বিশেষভাবে ধর্মপ্রাণা। গান্ধীজির মতাদর্শের মৌলিক ভিত্তি হল ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা। এই ধারণার মূল কথা হল এক সদাবর্তমান মৌলিক আধ্যাত্মিক সত্য।

সত্য ও ভগবান

ঈশ্বর হলেন স্বয়ং অস্তিত্বমান। তিনি হলেন সর্বজ্ঞ ও এক জীবন্ত শক্তি। এই শক্তির সঙ্গে জাগতিক অন্য সকল শক্তি দৃঢ় সংলগ্ন থাকে। ঈশ্বরীয় সত্তা হল এক প্রাণময় আলো। জগতের সবকিছু এর অন্তর্ভুক্ত ('An all embracing living Light')। এঁকে সচ্চিদানন্দ বা ব্রহ্ম বা রাম বলা যায়। গান্ধীজি ভগবানকেই সহজভাবে বলেছেন 'সত্য' (truth)। এ বিষয়ে গান্ধীজির ধারণা বেদান্তের আস্তিকতামূলক ব্যাখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গান্ধীজি দয়াময় ঈশ্বরের কথা বলেছেন। দয়াময় ঈশ্বর ভক্তের ডাকে সাড়া দেন, ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করেন। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁর মধ্যে এই প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ "I cannot recall a single instance

when, at the eleventh hour, He (God) has forsaken me." গান্ধীজি কিন্তু ভগবান ও ভক্তকে এক করে দেখেন নি। ভক্তকে প্রার্থী এবং ভগবানকে প্রার্থনা পূরণকারী হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন।

মহাত্মা গান্ধীর মতাদর্শের মধ্যে বৈদান্তিক আধ্যাত্মিক অধিবিদ্যার সঙ্গে জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব দর্শনের অহিংসা নীতির এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। তিনি আধ্যাত্মিক সত্যের উপর জোর দিয়েছেন। এবং এই সত্য অনুধাবন ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক দক্ষতা বা অবধারণামূলক পূর্বজ্ঞানকে গান্ধীজি কোন রকম গুরুত্ব দেন নি। আধ্যাত্মিক সত্য অনুধাবন ও উপলব্ধির জন্য তিনি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ; নির্মল, পবিত্র ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন এবং অহিংসার আদর্শকে নিষ্ঠা সহকারে কর্মে ও মননে অনুসরণ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গান্ধীজি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি জীবনযাপনকে যত বেশী সুশৃঙ্খল করেছেন, তিনি তত বেশী সত্য উপলব্ধির নিকটবর্তী হয়েছেন। সত্যের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সত্যকে নিয়ে তিনি সতত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সত্যকে নিয়ে গান্ধীজির পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রয়োগ-পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী অনুসন্ধান প্রক্রিয়া সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক ছিল। গান্ধীজির মতানুসারে সত্যাগ্রহীর একমাত্র ভরসা হলেন ভগবান। 'ভগবানের উপর ভরসাই হল নিরাপদ নিরাপত্তা'—এই বোধই ব্যক্তিকে নির্ভয় করে। 'মহান ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ; তিনি পরম দয়ালু'—সত্যাগ্রহীর মধ্যে এই বিশ্বাস একান্তভাবে অপরিহার্য। এই বিশ্বাস প্রবল শক্তি সঞ্চারিত করে। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে গাছের পাতাও নড়ে না। তিনি বলেছেন : "Nothing can happen but by His will expressed in his eternal changeless Law which is He." তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী শেষ বিচারে ঈশ্বর বা সত্যই হল চূড়ান্ত বাস্তব এবং সর্বশক্তিমান। সুতরাং সত্য বা ভগবানই হলেন জগতের যাবতীয় প্রধান নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রক। চূড়ান্ত পর্যায়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে গান্ধীজি সত্য ও ভগবানের এই নিয়ন্ত্রণমূলক অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এ কথা ঠিক। কিন্তু তিনি নিয়তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। কারণ তিনি ছিলেন কর্মযোগী। গীতার কর্মযোগের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সুতরাং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রাধান্যের উপর গুরুত্ব আরোপের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজি নিরন্তর কর্মযোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সত্যাগ্রহীর ভরসা ভগবান

৭.৩.খ. গান্ধীজির অহিংসা নীতি (Gandhi's Concept of Non-Violence)

গান্ধীজি ছিলেন সামগ্রিকভাবে সত্যাগ্রহী। সত্যাগ্রহী হিসাবে তিনি ছিলেন অহিংসা নীতির অনুগামী। মানব সভ্যতার ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারা থেকে গান্ধীজি অহিংসার গতি ও উদ্দেশ্যের সন্ধান পেয়েছেন। মানবজাতির ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনা করে তিনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, মানুষ হিংসা পরিত্যাগ করে ক্রমশঃ অহিংসার পথে অগ্রসর হয়েছে। মানব ইতিহাসের এই অহিংস গতিধারা সম্পর্কিত গান্ধীজির বিচার-বিশ্লেষণের পিছনে সনাতন হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য ; গভীর ঈশ্বরবিশ্বাস ; সততা, নৈতিকতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীর সদর্থক ক্রিয়া অনস্বীকার্য। অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভর্মা (V. P. Varma) তাঁর *Modern Indian Political Thought* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "He (Gandhi) interpreted history in the terms of the progressive indication of the superiority of Ahimsa." অহিংসা গান্ধীদর্শনের মূলমন্ত্র। মহাত্মা গান্ধী সারা জীবন ধরে অহিংসার মতকে অবলম্বন করে এগিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন : "Non-violence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed."

মানব ইতিহাসের অহিংসা গতিধারা

গান্ধীজির মতানুসারে অহিংসা অন্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত এবং দুর্বলতার সঙ্গে দূরত্বযুক্ত। অহিংসা হল বীরোচিত আত্মার স্থিরসঙ্কল্প শক্তির অটল অভিব্যক্তি। অহিংস হল চূড়ান্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক। অধ্যাপক ড. ভর্মা বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন : "Ahimsa was the farthest removed from acquiescence in evil or from a false masquerade for one's weakness. It was demonstration of the resolute strength of the heroic soul which refuses to hurt anybody because every living creature is essentially spirit and fundamentally one with himself. It is the symbol of supreme moral and spiritual strength. Meticulous care for the right of the least among us is the *sine qua non* of non-violence." অহিংসা দুর্বলতা নয়, বীরের শক্তি। প্রকৃত অহিংসা হল একটি প্রবল শক্তি। অহিংসার এই শক্তিকে অতিমাত্রায় শক্তিধর সরকারের বিরুদ্ধেও সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। অহিংসাকে দুর্বলের অসামর্থ্য হিসাবে অবজ্ঞা করা অসঙ্গত। অহিংসা হল মানুষের সর্বোত্তম শক্তি।

অহিংসা দুর্বলতা নয় বীরের শক্তি

গান্ধীজির অভিমত অনুযায়ী অহিংসা নিছক একটি নেতিবাচক ধারণা নয়। অন্য জনের প্রতি হিংস্র আচরণ বা ক্ষতি সাধন থেকে বিরত থাকা বা সংযমী আচরণই অহিংসা নয়। অহিংসার মধ্যে কোন রকম তিক্ততা, স্বার্থপরতা বা অহংবোধ থাকে না। অহিংসা হল সম্পূর্ণ একটি সদর্থক ধারণা। প্রেম, সৎচিন্তা, অপরিগ্রহের মধ্যে অহিংসার ইতিবাচক অভিব্যক্তি ঘটে। অসৎ চিন্তা পরিহার, মিথ্যাচার ও ছল-চাতুরি বর্জন, প্রাণশক্তির বিকাশ প্রভৃতির মধ্যেই আছে অহিংসার নীতি। অধ্যাপক ড. ভর্মা (V. P. Varma) তাঁর *Political Philosophy of Mahatma Gandhi and Sarvodaya* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ Ahimsa is not merely the negative act of refraining from doing offence, injury or harm to others, but really it represents the ancient law of positive self-sacrifice and constructive suffering." অহিংসা হল পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতির এক বন্ধন। মানবিক কাজকর্মের মধ্যে অহিংসার অভিব্যক্তি ঘটে প্রেম-ভালবাসা ও সম্প্রীতি-সদ্ভাবের ব্যাপক বিকাশের মাধ্যমে। সঙঘনীতির ভিত্তিতে নিরন্তর প্রেম-প্রীতি, মননশীলতা ও অধ্যবসায়কে সুনিশ্চিত করার মধ্যে গান্ধীজি অহিংসার অনুসন্ধানের কথা বলেছেন। গান্ধীজি অহিংসার মধ্যেই সামাজিক ন্যায়ের সন্ধান পেয়েছেন। অহিংসার মধ্যেই প্রেম- প্রীতি এবং স্বাধীনতা ও সমতার নীতি বর্তমান।

অহিংসার ধারণা

মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে সত্য এবং অহিংসা পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। অধ্যাপক ড. ভর্মা বলেছেন ঃ "Gandhi considered truth and non-violence to be absolutely binding." মহাত্মার মতানুসারে সত্যের মধ্যে অহিংসা আছে এবং অহিংসার মধ্যে সত্য আছে। গান্ধীজির কাছে সত্যই ভগবান। অহিংসাই গান্ধীজির ভগবান, সত্যই তাঁর ভগবান। অহিংসাই সত্য এবং সত্যই অহিংসা এবং সত্য ও অহিংসা উভয়ই হল তাঁর ঈশ্বর। অহিংসা হল গান্ধীজির কাছে পরম ধর্ম, সত্য ও সনাতন। সত্যের জন্য সত্যান্বেষীকে সকল রকম দুর্ভোগের মুখোমুখি হতে হয়। অহিংসা বলতে অসীম ভালবাসাকে বোঝায়। এবং ভালবাসা বলতে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের অসীম সামর্থ্যকে বোঝায়। মহাত্মার মতানুসারে সত্যাগ্রহীকে অহিংসার মাধ্যমে সত্য উপলব্ধির জন্য নিরন্তর ও অক্লান্তভাবে উদ্যোগী হতে হবে। একমাত্র অহিংস পথে সত্যানুন্ধান ও সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। গান্ধীজির অভিমত অনুযায়ী দেহ, ক্ষমতা ও অর্থের মোহ বড় নয়। তিনি মোক্ষের আনন্দকেই বড় করে দেখিয়েছেন। এবং এই মোক্ষের আনন্দ লাভ অহিংস সত্যাগ্রহের পথেই সম্ভব। অধ্যাপক ড. ভর্মা (V. P. Varma) তাঁর *Political Philosophy of Mahatma Gandhi and Sarvodaya* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন ঃ "Ahimsa is vitally integrated with Truth of God....The social application of ahimsa is postulated upon the acceptance of spiritual metaphysics and the implied necessity of the growth of social charity. The law of love and respect for life, if courageously practised is bound to lead to the elevation of the accent, quality and character of politics and civilisation."

সত্য ও অহিংসা

গান্ধীজির অভিমত অনুযায়ী অহিংসা কাপুরুষতা ও ভীরুতার সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত। বরং বলা ভাল যে অহিংসা ভীরুতার বিরোধী। কাপুরুষ ও ভীরু ব্যক্তি অহিংস পথের পথিক হতে পারে না। সত্যাশ্রয়ী ও সাহসী ব্যক্তিই অহিংসার সাধনা করতে পারেন। অন্যের পক্ষে অসম্ভব। ভয়ে ভীত মানুষ অহিংস নীতি অনুসরণ করতে অক্ষম। যিনি সত্যাশ্রয়ী ও সাহসী, তিনি বিপদে বিচলিত হন না, ভয়কে জয় করতে পারেন, অহিংস পথে যাবতীয় প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে পারেন। নির্ভয় মানুষের মন অহিংস হতে পারে। ভীত মানুষ অহিংস হতে পারে না। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার কথা বলতে গিয়ে গান্ধীজি বলেছেন যে অহিংস প্রতিরোধই হল সর্বোৎকৃষ্ট। ভয়ে ভীত হয়ে আনুগত্য প্রদর্শনকে তিনি নিকৃষ্ট বলেছেন। এর থেকে তিনি বরং হিংসাত্মক প্রতিরোধকে উপরে স্থান দিয়েছেন।

অহিংসার মধ্যে ভয় নেই

অহিংসার পথ ও নীতি নিয়ে গান্ধীজি নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। মানব কল্যাণের ধারণা এবং ন্যায়ের প্রেরণা এ ক্ষেত্রে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। অহিংসা নিয়ে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে নিহিত আছে গান্ধীজির সত্যানুসন্ধান ও আত্মানুসন্ধান। মহাত্মার অহিংসা দর্শনের মধ্যে শ্রমের মর্যাদার কথাও আছে। এ প্রসঙ্গে তিনি অহিংসা শিক্ষার কর্মসূচীর কথাও বলেছেন। গান্ধীজি শিশুর অহিংসবোধের বিকাশের স্বার্থে সহায়ক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার কথা বলেছেন। তেমনি আবার শিশুর সামাজিক বিকাশের উদ্দেশ্যে তিনি সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

অহিংস শিক্ষার প্রয়োজন

গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে, সম্পূর্ণ অহিংসা অসম্ভব। পরিপূর্ণ অহিংসা দৈহিক অস্তিত্বের দুনিয়ায় সম্ভব হতে পারে না। মহাত্মার মতানুসারে অহিংসার বৃহত্তর স্বার্থে অনেক সময় হিংসার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন

হতে পারে এবং হয়ও। এ প্রসঙ্গ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, জীবন রক্ষা করার জন্য, সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার জন্য, খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য আঘাত, মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও গান্ধীজি মানুষকে অহিংসা ও সত্যের জন্য সতত সচেষ্ট হতে ও থাকতে বলেছেন। মহাত্মা গান্ধী আপেক্ষিক ধারণা হিসাবে অহিংসার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

অহিংসা আপেক্ষিক ধারণা

গৌতম বুদ্ধ বা মহাবীরের মত গান্ধী অহিংসাকে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যমূলক বিষয় বা কর্ম হিসাবে বিবেচনা করেন নি। গান্ধীজি অহিংসাকে জনসাধারণের কাজকর্মের সফল কার্যপ্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য করেছেন। অধ্যাপক ড. ভর্মা (V. P. Varma) তাঁর *Political Philosophy of Mahatma Gandhi and Sarvodaya* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন ঃ "Gandhi's greatness as a leader and a thinker lay in his transformation of the individualistic message of non-violence into a successful technique of direct man action." গান্ধীজির বক্তব্যের মাধ্যমে অহিংসার দ্বিবিধ ব্যঞ্জনা প্রতিপন্ন হয়। মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অহিংসার আদর্শের কথা বলেছেন। হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ যেমন ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সংঘটিত হতে পারে এবং হয়, তেমনি অহিংসার আদর্শ ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে হওয়া দরকার।

গান্ধীজির অহিংসা নীতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Gandhi's Concept of Non-violence)

অহিংসা সম্পর্কিত মহাত্মা গান্ধীর ধারণা পর্যালোচনা করলে কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অহিংসার গান্ধীবাদী ধারণার এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

(১) আক্ষরিক অর্থে অহিংসা বলতে অপরের প্রতি হিংসা না করা বা অন্যের ক্ষতি না করাকে বোঝায়। কিন্তু এ হল অহিংসার সংকীর্ণ অর্থ। কিন্তু ব্যাপক অর্থে অহিংসা নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক। ব্যাপক ও ইতিবাচক অর্থে অহিংসা হল অপরের কল্যাণ সাধন করা। অহিংসার উদ্দেশ্য হল প্রতিপক্ষকে ভালবাসা এবং ভালবেসে তাঁর হৃদয় জয় করা। এ হল সকলের জন্য সক্রিয়ভাবে কল্যাণ কামনা।

(২) অহিংসা দুর্বলের হাতিয়ার নয়, এ হল সবলের অস্ত্র। ভীতু ব্যক্তিরা জীবনের ঝুঁকি নেয় না। তাই ভীতু ব্যক্তিরাই সাধারণত হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। সাহসী ব্যক্তিরাই অহিংসার আদর্শের অনুগামী হতে পারে। যে সব ব্যক্তি অন্যের জীবন নিতে উদ্যত তাদের হাতেই অহিংস ব্যক্তি নিজের জীবনকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। অহিংস দর্শন অনুযায়ী, ব্যক্তি তার জীবনকে যতই অন্যের হাতে ছেড়ে রাখে ততই তার জীবনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়।

(৩) অহিংসা হল সভ্য মানুষের হাতিয়ার, হিংসা অসভ্য মানুষের। হিংসা হল পশুশক্তির প্রকাশ। অপরদিকে অহিংসা হল আধ্যাত্মিক শক্তি বা আত্মিক শক্তির অভিব্যক্তি।

(৪) আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন ধার্মিক মানুষের কাছে অহিংসার আদর্শ হল ঈশ্বরীয় নির্দেশ।

(৫) হিংসা ডেকে আনে হিংসা, ঘৃণা ডেকে আনে ঘৃণা। হিংসা প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। অহিংসা দিয়েই এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটান সম্ভব। অহিংসা নীতির মাধ্যমে মানুষের বিবেকের কাছে এবং সুকুমার বৃত্তিসমূহের কাছে আবেদন জানান হয়। ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যক্তির উপর কোন রকম চাপ সৃষ্টি করা হয় না। এইভাবে প্রতিপক্ষের মর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

(৬) অহিংসা হল প্রেম-প্রীতির প্রকাশ। স্বভাবতই অহিংসা হিংসার থেকে উন্নত। অহিংস আদর্শের অনুগামী ব্যক্তি প্রতিপক্ষের উপর শাস্তিমূলক কষ্ট চাপিয়ে না দিয়ে, নিজের কাঁধেই তা টেনে নেয়। অহিংসা হল আত্মোৎসর্গমূলক ভাববাসার অভিব্যক্তি। এই কারণে বিবদমান উভয় পক্ষের কাছেই অহিংসা নীতির অনুসরণ অভিপ্রেত। উভয় পক্ষই অহিংসা নীতির অনুগামী হয়ে নৈতিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে লাভবান হয়।

(৭) কোন একটি কাজ অহিংস নাকি সহিংস প্রকৃতির তা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া এবং তার উদ্দেশ্য অনুধাবন করা আবশ্যক। সাধারণভাবে অহিংসা বলতে বোঝায় কাউকে আঘাত বা কারোর কোন ক্ষয়-ক্ষতি না করা। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে কোন একটি জীবের নিরাময়ের অযোগ্য অসহনীয় যন্ত্রণা ও কষ্টের অবসানের জন্য জীবটির জীবনহানির প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। কোন একটি জীবের যে রোগ-যন্ত্রণার মর্মান্তিক কষ্টের নিরাময় মানুষের সাধ্যের অতীত গান্ধীজি সেক্ষেত্রে হত্যা করার বিধানকে অনুমোদন করেছেন। তিনি হত্যাকাণ্ডকে হিংসা হিসাবে না দেখে অসহনীয় রোগ-যন্ত্রণার অবসান হিসাবে প্রতিপন্ন করার পক্ষপাতী।

(৮) অহিংসা-নীতি অনুসারে মানুষকে হিংসামূলক আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে অহিংসা নীতির স্বার্থে হিংসামূলক আচরণের আশ্রয় নিতে হতে পারে। অহিংসার বৃহত্তর স্বার্থে অনেক সময় হিংসা আসতে পারে এবং আসে। অহিংসা বলতে কখনই কোন ক্ষেত্রে আঘাত করা বা মৃত্যু ঘটান যাবে না, এমন কথা গান্ধীজি বলেন নি। নিজের জীবন রক্ষা ও খাদ্য আহরণের জন্য আঘাত করা বা মৃত্যু বা মৃত্যু ঘটাবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। জীবন বাঁচানোর জন্য বিষধর সাপ বা পাগলা কুকুরের মৃত্যু ঘটান ; আবার খাদ্যশস্য ধ্বংসকারী প্রাণীর মৃত্যু ঘটান অহিংসবিরোধী আচরণ নয়। তেমনি আবার আশ্রয়প্রার্থীর জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে অনন্যোপায় হয়ে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে হিংসামূলক আচরণের আশ্রয় নিতে হতে পারে। নিজের জীবন ও মর্যাদা রক্ষার অধিকার ও কর্তব্য প্রত্যেক মানুষেরই আছে। কোন দেশ বা জাতির ক্ষেত্রেও এ কথা সমভাবে সত্য। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অধিকার ও কর্তব্য প্রত্যেক দেশ ও জাতির আছে।

(৯) অহিংসা হল হিংসাকে পরিত্যাগ করার প্রচেষ্টা। মানুষের সুস্থ সমাজজীবনের স্বার্থে এটা অপরিহার্য। তবে অহিংসার আচরণ হবে স্বতঃস্ফূর্ত, সমবেদনাযুক্ত এবং সতত সকলের কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত।

গান্ধীজির অহিংসা নীতির সমালোচনা (Criticism of Gandhi's Concept of Nonviolence)

মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। সমালোচকরা বিভিন্ন দিক থেকে এই নীতির সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিরূপ সমালোচনা প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীরা বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেন।

(ক) সাধারণভাবে মানুষের জীবনধারার বিভিন্ন দিক গান্ধীজির অহিংসা নীতির অন্তর্ভুক্ত। অহিংসা তত্ত্বটি সাধারণ বিচারে সর্বব্যাপক। এতদ্‌সত্ত্বেও নীতিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য। সমাজের সকলে ধর্মানুরাগী বা ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়। মানবসমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিরীশ্বরবাদী। মার্কসবাদীরা ধর্মকে আমজনতার কাছে আফিম হিসাবে গণ্য করেন। তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। মানুষকে তাঁরা ধর্মের ঘানি থেকে মুক্ত করার পক্ষপাতী। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী মানুষের কাছে অহিংসা তত্ত্বের কোন আবেদন নেই।

(খ) মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক প্রকৃতির। রূঢ় বাস্তবের রাজনীতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজির অহিংসা নীতির প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে সন্দেহের অবকাশ আছে। বাস্তব রাজনীতিতে হিংসাত্মক কাজকর্ম প্রায়শই প্রাসঙ্গিক প্রতিপন্ন হয়। স্বভাবতই রাজনীতিক ক্ষেত্রে অহিংসা নীতির প্রয়োগযোগ্যতা প্রসঙ্গে বিতর্ক দেখা দেয়। বলা হয় যে বাস্তব রাজনীতিতে হব্‌স ও মেকিয়াভেলির নীতিই অধিকতর কার্যকরী প্রতিপন্ন হয়। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবে রাজনীতির তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে গান্ধীজির অহিংসা নীতি অনেকাংশে অর্থবহ প্রতিপন্ন হয়। এবং অহিংসা নীতিকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে অনুসরণ করা সম্ভব।

(গ) বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অহিংসা নীতি অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন প্রতিপন্ন হয়। তবে মহাত্মা গান্ধী দাবি করেছেন যে জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অহিংসা নীতি সমভাবে প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ।

অহিংসা নীতির প্রথম উত্থাপক বা উদ্ভাবক হিসাবে মহাত্মা গান্ধীর নাম করা যায় না। প্রাচীন ভারতের ধর্মগুরুরা অনেক আগেই সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে অহিংসা নীতির আদর্শ প্রচার করেছেন। গান্ধীজি নিজেই স্বীকার করেছেন যে ভারতভূমিতে অহিংসার আদর্শ পর্বতের মতই প্রাচীন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের পাতা থেকে গান্ধীজি অহিংসা নীতির ধারণাকে তুলে এনেছেন। গান্ধীজি অহিংসা নীতিকে তাঁর জীবনধারার মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অহিংসা নীতিকে সমকালীন মানবসমাজের প্রয়োজন পূরণের এক কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন। বাস্তব রাজনীতির প্রকৃতিগত পরিবর্তন বা সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে গান্ধীজি অহিংসা নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এবং অহিংসা নীতিকে তিনি সামাজিক ও রাজনীতিক একটি প্রক্রিয়ায় পরিণত করেছিলেন। এর মধ্যেই মহাত্মার মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব নিহিত আছে।

উপসংহার

৭.৩গ গান্ধীজির সত্যাগ্রহ নীতি (Gandhi's Concept of Satyagraha)

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার আলোচনায় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দর্শনের সদর্থক অবদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গান্ধীজির কাছে সত্যাগ্রহ তত্ত্ব হল সুসংহত জীবনদর্শন। ব্যক্তিকে তিনি সমাজমুখী ও সত্যাগ্রহী করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যক্তির আত্মসুখ ও অহংসর্বস্বতার তিনি বিরোধিতা করেছেন। ব্যক্তিমানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য তিনি বিবেক, আত্মশুদ্ধি, আত্মসমালোচনা ও

প্রতিবাদ প্রভৃতি গুণাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সত্যাগ্রহের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী মানুষকে নিষ্কলুষ এবং সৎ ও সমাজসচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর সত্যাগ্রহ দর্শন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের উদারনীতিক ও উপযোগিতাবাদী দর্শনকে অতিক্রম করে গেছে। সত্যাগ্রহের রাজনীতিতে গান্ধীজি নীতিকে উচ্চাসন প্রদান করেছেন। তিনি সত্যাগ্রহের আদর্শ ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা ও প্রচার করেছেন 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন'-এ। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে সত্যাগ্রহ সমিতির মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে সত্যাগ্রহের আদর্শকে বাস্তবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। সত্যাগ্রহ তত্ত্বের চরম পরীক্ষা হয়েছে ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী বিভিন্ন সংগ্রামে এবং সবরমতীর 'সত্যাগ্রহ আশ্রমে'।

সত্যাগ্রহ তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ

টলস্টয়ের অহিংস ও প্রেমের বাণী, গীতার নিষ্কাম কর্ম, খ্রীস্টের সত্য ও মানবতার আদর্শ, মহম্মদের সহজ-সরল জীবনদর্শন প্রভৃতি গান্ধীজিকে সত্যাগ্রহের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। 'সর্বোচ্চ সুখ লাভের জন্য মানুষকে সমবায় ও সেবাকার্যে নিজেকে নিবেদন করতে হবে'—রাস্কিনের এই তত্ত্ব গান্ধীজিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। সমবায় ও সমষ্টি উন্নয়নের আদর্শের দ্বারা মহাত্মা গান্ধী অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ফিনিক্স নামক জায়গায় সর্বপ্রথম এক সমবায়িক সমাজ গড়ে তোলেন। সত্যাগ্রহের সাধনার সূত্রপাত ঘটেছে এই সমবায়িক সমাজে। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেন্সবার্গে টলস্টয়ের প্রেম ও অহিংসার আদর্শে 'টলস্টয় ফার্ম' গড়ে তোলা হয়। এই ফার্মে গান্ধীজি সাফল্যের সঙ্গে সত্যাগ্রহের আদর্শ ও তত্ত্বের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সত্যাগ্রহ দর্শনের শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠা এবং প্রেম ও অহিংসার আদর্শ গান্ধীজি নিজে শিখেছেন এবং মানবজাতিকে শিখিয়েছেন নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এই অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রাপ্ত আঘাত, সমবায় জীবন ও জেল জীবন সূত্রে।

সত্যাগ্রহের সৃষ্টি

গান্ধীজির অহিংসা নীতির মত সত্যাগ্রহের ধারণা ব্যাপকভাবে অর্থবহ। সত্যাগ্রহ হল সত্যের জন্য নৈতিক চাপ সৃষ্টি। মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে অহিংস পথে সত্যের উপলব্ধির জন্য সত্যাগ্রহীকে সতত সক্রিয় থাকতে হবে। সত্যাগ্রহীর পক্ষে এটা অপরিহার্য ও আবশ্যিক। গান্ধীজি সত্যকে চূড়ান্ত বাস্তব হিসাবে গণ্য করেছেন। সুতরাং সত্যাগ্রহীকে সত্যের উপর যাবতীয় আক্রমণকে সর্বপ্রকারে প্রতিহত করতে হবে।

সত্যাগ্রহ হল এক সুসংহত জীবনদর্শন। সত্যাগ্রহ হল সত্যানুসারে সমবেত এক সমবায়িক উদ্যোগ। এ হল এক সত্যদর্শন। সত্যাগ্রহ হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। কিন্তু এই প্রতিরোধ বাহ্যিক কোন শক্তি দিয়ে নয়, এই প্রতিরোধ আত্মিক শক্তি দিয়ে। এই প্রতিরোধ অস্ত্র দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। বাহুবল বা পশুশক্তি নয়, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিই হল সত্যাগ্রহীর শক্তি। সত্যাগ্রহীর মধ্যে সৈন্যের সকল গুণ বর্তমান থাকবে ; কিন্তু হিংসা বা ঘৃণা থাকবে না। সত্যাগ্রহ হল সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ। সত্যাগ্রহীর মধ্যে ধন-সম্পত্তিতে আসক্তি থাকবে না। দারিদ্র্য সত্ত্বেও সত্যাগ্রহী হবে নির্ভীক। সে হবে সৎ ও উন্নত মনের অধিকারী। অনিষ্টকারী ইচ্ছা বা ঘৃণা-প্রবঞ্চনা থাকবে না, থাকবে সামগ্রিক প্রেম-প্রীতি। সত্যের সন্ধানে সত্যাগ্রহী নিজের দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে অপর সকলের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংযুক্ত করবে। সত্যাগ্রহী খোলা মন নিয়ে চলবে, অপরকে জানবে ও অপরের প্রতি আন্তরিক হবে এবং অপরের বিশ্বাসভাজন হবে। সত্যাগ্রহ হল এক সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ক্রোধ-হিংসা বিদ্বেষ বর্জিত। এই সংগ্রাম হল সত্য ও ন্যায়ের জন্য। এ হল প্রতিপক্ষের প্রতি প্রেম-প্রীতির মানসিকতা নিয়ে প্রতিপক্ষকে জয় করার সংগ্রাম। এই সংগ্রামের পিছনে আছে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের বাসনা। এই সংগ্রাম সুখ-দুঃখ বর্জিত। এর মধ্যে জয়-পরাজয়ের ভাবনা বা আশংকা নেই। সত্যাগ্রহীর সংগ্রামে অস্ত্রবল, বাহুবল বা পশুশক্তির ব্যবহার নেই, আছে অন্যায়ের মুখোমুখি দৃঢ় মানসিক ও আত্মিক শক্তি। সত্যাগ্রহ দুর্বলের আত্মপ্রবঞ্চনা নয়, সংগ্রাম থেকে সরে পড়া নয়, এ হল মানসিক ও আত্মিক শক্তিসহ অন্যায়ের মুখোমুখি হওয়া। মানবিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত অধিকারকে বা ন্যায্য অধিকারকে সাহসের সঙ্গে সংরক্ষণ করতে হবে। সুখ-দুঃখ, ক্রোধ-ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতিকে বিসর্জন দিয়ে সত্যাগ্রহীর উদ্দেশ্য হবে প্রতিপক্ষকে ন্যায় ও সত্যের পক্ষে নিয়ে আসা। সত্যাগ্রহী দৃঢ় মনোবল নিয়ে নৈতিক বাঁচার সংগ্রামের সামিল হবে। সে শুদ্ধ মনের নির্দেশে পরিচালিত হবে। সত্যাগ্রহী আঘাত পেলে তা সহ্য করবে, প্রত্যাঘাত করবে না। সত্যাগ্রহী হবে আত্মসংযমী ও সত্যনিষ্ঠ এবং অহিংসা ও ক্ষমার জীবন্ত প্রতীক। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভর্মা (V. P. Varma) তাঁর *Political Philosophy of Mahatma Gandhi and Sarvodaya* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "It signifies a genuine, intense and sincere quest for truth which is God. I mean an assertion of the power of the human soul against political and economic domination. Satyagraha is the indication of the

সত্যাগ্রহের ধারণা

সত্যাগ্রহের অর্থসত্যাগ্রহের ধারণা

glory of the human conscience .....Conscience reinforces the battle for victory of the social good. Satyagraha is based on the invincible belief in the ultimate triumph of divine justice and right."

সত্যাগ্রহ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়। কারণ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে থাকে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার আকাঙ্ক্ষা, থাকে পশুশক্তি প্রয়োগের মানসিকতা। তাছাড়া নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীও প্রতিপক্ষকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত দেখতে চায় এবং এর মধ্যে তার আনন্দানুভূতি বর্তমান থাকে। কিন্তু সত্যাগ্রহের মধ্যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কোন রকম বাসনা থাকে না, থাকে না অরাজকতা সৃষ্টি করার কোন অভিপ্রায়। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন : "Satygraha differs from passive resistance as North Pole from the South Pole. The latter has been conceived as a weapon of the weak and does not exclude the use of physical force or violence for the purpose of gaining one's end, whereas the former has been conceived as the weapon of the strongest and excludes the use of violence in any shape or form." সত্যাগ্রহ মানেই আইন অমান্য করা নয়। বরং এ হল প্রয়োজন হলে অম্লান বদনে দুঃখ-দণ্ড ভোগের প্রস্তুতি বা সম্মতি। সত্যাগ্রহ হল মানসিক দৃঢ়তা সহকারে সামনে এগিয়ে চলা এবং প্রতিপক্ষকে ন্যায় ও সত্যের পক্ষে পরিবর্তিত করা। সত্যাগ্রহের আদর্শ হিসাবে যে সমস্ত গুণাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেগুলি হল : প্রেম-প্রীতি, স্থৈর্য-সংযম, ক্ষমা-উদারতা, আত্মশক্তি ও আত্মার মুক্তি প্রভৃতি। সত্যাগ্রহের প্রথম পরীক্ষা হল ব্রহ্মচর্য ও আত্মনির্ভরশীলতা। দ্বিতীয় পরীক্ষা হল সত্য ও ন্যায়ের পথে এগিয়ে যাওয়ার সাহস। সত্যাগ্রহের চরম পরীক্ষা হিসাবে বলা হয়েছে কর্তব্যের খাতিরে নির্ভয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়ান, অহিংস পথে অন্যায়ের প্রতিরোধ, দুঃখ-যন্ত্রণার ঝুঁকি নিয়ে মানসিক শক্তি সহকারে সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রামের সামিল হওয়া, সংগ্রাম থেকে সরে পড়া বা আত্মপ্রবঞ্চনা নয় প্রভৃতি। সত্যাগ্রহের ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে গান্ধীজি বলেছেন : "Satyagraha is literally holding on to truth, and it means, therefore, and is known as, soul force." সত্যতা ছাড়াও সত্যাগ্রহের অপর দুটি নীতি হচ্ছে অহিংসা এবং আত্ম-পীড়ন। সত্যাগ্রহীরা একদিকে যেমন নিজের জন্য স্বাধীনতা চায়, পাশাপাশি প্রতিপক্ষের স্বাধীনতারও তারা স্বীকৃতি দেয়। এই ধরনের আন্দোলনে জনগণ ব্যাপক আকারে অংশগ্রহণ করে। কারণ দুর্বল, নিরস্ত্র ভারতের মানুষ এর মধ্যে তাদের নিজস্বতা, ঐতিহ্য ইত্যাদিকে খুঁজে পায়। ইতি-মধ্যে ভারতের মুষ্টিমেয় অংশের মধ্যে যে সাংবিধানিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তা ছিল মূলতঃ নিম্নবর্গের মানুষজনের চৌহদ্দীর বাইরে। গান্ধী এর বিরোধিতা করেছেন। কারণ, এই পদ্ধতি ব্রিটিশদের নিজস্ব, যা ভারতীয় জনগণের ঐতিহ্যের বাইরে অবস্থান করে। অন্য দিকে সাংবিধানিকতার বাইরে হিংসাত্মক পদ্ধতি যদি জনগণ গ্রহণ করে তবে তাকে ব্রিটিশ সরকার অচিরে দমন করে পাল্টা হিংসা নামিয়ে আনবে। সাংবিধানিক এবং হিংসাত্মক পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্রিটিশরা সমর্থ। কারণ এই দুটি সম্পর্কেই অভিজ্ঞতা তাদের যথেষ্ট। তাই গান্ধী সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বনের পক্ষে, যাকে মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা ব্রিটিশদের নেই। তাই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মুখোমুখি ব্রিটিশ শাসন অসহায়তা বোধ করে।

সত্যাগ্রহের অর্থ

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দর্শন পর্যালোচনা করলে এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যাগ্রহ তত্ত্বের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

(ক) সত্যাগ্রহ হল এক আত্মিক শক্তি। সকল রকম অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই আত্মিক শক্তির সক্রিয় ভূমিকার কথা বলা হয়। সত্যাগ্রহীর মধ্যে প্রতিপক্ষের প্রতি হিংসা-দ্বেষ বা বিদ্বেষের মনোভাব থাকে না। কারণ সত্যাগ্রহ তত্ত্বে প্রতিপক্ষের উপর বলপ্রয়োগের পরিবর্তে প্রতিপক্ষকে পরিবর্তিত করার কথা বলা হয়। সত্যাগ্রহীর অহিংস প্রতিরোধ প্রতিপক্ষের হৃদয়কে নাড়া দেয়। সত্যাগ্রহ দর্শনে প্রেম-ভালবাসার মাধ্যমে হৃদয় পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার উপর জোর দেওয়া হয়।

আত্মিক শক্তি

(খ) সত্যাগ্রহ হল ব্যক্তির জন্মগত অধিকারের মত। কিন্তু সত্যাগ্রহের আদর্শ অনুসরণের জন্য ব্যক্তি-মানুষের জীবনধারার আত্মশৃঙ্খলা যেমন দরকার, তেমনি দরকার যাবতীয় দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করার প্রস্তুতি ও ক্ষমতা।

(গ) বিভিন্ন পথে ও পদ্ধতিতে সত্যাগ্রহের আদর্শকে অনুসরণ করা যায়। কিন্তু সত্যাগ্রহের সকল উপায়-পদ্ধতির মূল ভিত্তি হবে অহিংসার আদর্শ। সত্যাগ্রহ অনুশীলনের উপায়-পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রতীকী বা আমরণ অনশন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ধরনা, ধর্মঘট, বিদেশী দ্রব্যসামগ্রী বয়কট, সরকারী অনুষ্ঠান বয়কট, সম্মানসূচক উপাধি ও পদ প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি।

অহিংসার আদর্শ

(ঘ) নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও সত্যাগ্রহ সমার্থক নয়। সত্যাগ্রহের সঙ্গে নির্মল হৃদয় সংযুক্ত থাকে। এবং সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থনীতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সত্যাগ্রহের আদর্শ অনুসরণ করা যায়। কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি পৃথক। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নির্মল ও নিষ্কলুষ হৃদয়ের অপরিহার্যতার কথা বলা হয় না। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ হল শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করার একটি হাতিয়ার এবং একমাত্র রাজনীতিক ক্ষেত্রে এই হাতিয়ার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়

(ঙ) সত্যাগ্রহ হল শক্তিমানের অস্ত্র ; হীনবলের হাতের হাতিয়ার নয়। সত্যাগ্রহের মধ্যে হিংসা ও ভীরুতার কোন স্থান নেই। গান্ধীজি ভীরুতাকে কোনভাবেই স্বীকার বা সমর্থন করেন নি। বরং কাপুরুষতা ও হিংস্রতার মধ্যে তিনি হিংস্রতার পক্ষ অবলম্বনের পক্ষপাতী। অন্যায়-অবিচারের নীরব দর্শক হয়ে থাকা এবং সত্যের উপর অসত্যের কর্তৃত্ব কায়েম হওয়া সত্যাগ্রহের বিরোধী।

(চ) সত্যাগ্রহ সূত্রে দ্বিবিধ সুবিধা পাওয়া যায়। সত্যাগ্রহের মাধ্যমে বাদী ও বিবাদী, নিপীড়ক ও নিপীড়িত উভয়ের কল্যাণ সাধিত হয়।

গান্ধীজির সত্যাগ্রহ নীতির সমালোচনা (Criticism of Gandhi's Concept of Satyagraha)

গান্ধীজির সত্যাগ্রহ তত্ত্বও বিরোধ-বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। সমালোচকরা সত্যাগ্রহ দর্শনেরও সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সত্যাগ্রহ নীতির বিরূপ সমালোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন যুক্তি অবতারণা করা হয়। সি. এম. কেস (C. M. Case) তাঁর *Non-Violent Coercion : A Study in Methods of Social Pressure* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

(১) সি. এম. কেসের অভিমত অনুযায়ী সত্যাগ্রহের বিভিন্ন উপায়-পদ্ধতি বাস্তবে বলপ্রয়োগ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। কারণ সত্যাগ্রহের বিভিন্ন উপায়-পদ্ধতির মাধ্যমে সত্যাগ্রহী প্রতিপক্ষকে উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন করে। প্রতিপক্ষ প্রবল মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে যায়। প্রতিপক্ষের প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিচয় দিতে গিয়ে সি. এম. কেস বলেছেন ঃ "Neither of the alternatives appeals to his desires or his judgement, yet he is compelled by the situation to chooše between them." প্রতিপক্ষের উপর এ ধরনের এক উভয় সংকটমূলক পরিস্থিতি চাপিয়ে দেওয়া বাস্তবে এক ধরনের বলপ্রয়োগ হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

(২) মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দর্শন অহিংসা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজি যে-কোন রকম বলপ্রয়োগের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু সত্যাগ্রহীর আচরণ প্রতিপক্ষকে এমন এক অবস্থার অধীন করে যে, প্রতিপক্ষ নিজেকে নিপীড়িত ভাবতে থাকে। বিবদমান উভয় পক্ষ সত্য ও আত্মিক শক্তির ভিত্তিতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সত্যাগ্রহের পথে পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তাহলে এক অভিনব জটিল অবস্থার উদ্ভব হয়। এ রকম অবস্থার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ তত্ত্বে পাওয়া যায় না। সমালোচকদের অভিমত অনুসারে সত্যাগ্রহের পন্থা-পদ্ধতি হল প্রতিপক্ষের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টির এক অভিনব কৌশল বিশেষ।

চাপসৃষ্টির কৌশল

(৩) মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দর্শনে দৃঢ় আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়। তা ছাড়া মানুষের সমুন্নত নৈতিক বিকাশ, সত্য ও ন্যায়ের জন্য আত্মকষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা, উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সুসংহত উদ্যোগ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই সমস্ত কারণে সত্যাগ্রহ মতবাদ তাত্ত্বিক বিচারে অতি উন্নত মানের। এ বিষয়ে বড় একটা বিরোধ-বিতর্ক নেই। কিন্তু বাস্তব বিচারে মতবাদটি অতিমাত্রায় আদর্শবাদী। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না।

আদর্শবাদী

(৪) গান্ধীজির সত্যাগ্রহ তত্ত্ব অনুরূপভাবে আবার অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক বা অধিবিদ্যক প্রকৃতিক। স্বভাবতই সত্যাগ্রহ দর্শনের বিভিন্ন ব্যঞ্জনা বা অভিব্যক্তি সকলের কাছে সম্যকভাবে অনুধাবনযোগ্য নয়।

অধিবিদ্যক

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দর্শনে সত্যের শক্তি ও আত্মশক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, চূড়ান্ত বিচারে সত্য সফল হবে। 'ধর্ম জয়তে' কথার তাৎপর্য হল সত্য সর্বদা প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ সত্যই হল ধর্ম। মানুষের আত্মশক্তির দুটি দিক বর্তমান। একটি হল সীমাবদ্ধ, অন্যটি অসীম। আত্মশক্তির সীমাবদ্ধ দিকটি ভ্রান্তিপূর্ণ ও দুর্বলতাযুক্ত, নির্মল-নিষ্কলুষ নয়। ভ্রান্তিপূর্ণ মিথ্যা আত্মশক্তির অভিব্যক্তির কথা বলা হয় নি, বলা হয়েছে সম্পূর্ণ সত্যভিত্তিক অসীম আত্মশক্তির বিকাশ ও অভিব্যক্তির কথা। ভ্রান্ত, সীমাবদ্ধ ও অসত্য আত্মশক্তির অভিব্যক্তি আক্রমণাত্মক। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ও অসীম আত্মশক্তির অভিব্যক্তি হল সত্যাগ্রহ। অসত্য যখন আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে, তখন তা প্রতিহত করা দরকার। এ রকম ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত থাকলে জনজীবন অসত্যের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। এই কারণে

উপসংহার

অসত্য আত্মশক্তির আক্রমণাত্মক অভিব্যক্তি প্রতিহত করার জন্য সত্যাগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৭.৩.ঘ. রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণা (Gandhi's Concept of The State)

মহাত্মা গান্ধী সুসংবদ্ধভাবে কোন স্বতন্ত্র 'রাজনৈতিক দর্শন' (Political Philosophy) প্রচার বা প্রতিষ্ঠা করেন নি। গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তা কোন প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমী রাষ্ট্রনীতিক দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উদারনীতিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, মার্কসবাদ, নৈরাজ্যবাজ প্রভৃতি পরিচিত কোন রাজনীতিক মতবাদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্র-ভাবনা সামঞ্জস্য রহিত। কিন্তু গান্ধীজির সামাজিক ও রাজনীতিক দর্শনের মধ্যে এই সমস্ত সুপরিচিত রাষ্ট্রনীতিক মতবাদের কিছু কিছু উপাদানের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রাষ্ট্র সম্পর্কিত উদারনীতিবাদ বা আদর্শবাদের সঙ্গে গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তার মিল নেই। কারণ তিনি রাষ্ট্রকে দেবতা হিসাবে প্রতিপন্ন করেন নি। আবার গান্ধীজির রাষ্ট্র-ভাবনা মার্কসবাদ বা অতি বৈপ্লবিক কোন মতবাদের সমগোত্রীয় নয়। কারণ তিনি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তির কথা বলেন নি। বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ ও মনীষীর মতাদর্শ ও ধ্যান-ধারণাকে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন করে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। গান্ধীজির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক জীবনের সমস্যাদি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ও অভিজ্ঞতাই রাষ্ট্রচিন্তার রূপ নিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অমানুষিক ভূমিকা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। আবার ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির শাসনাধীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়নমূলক প্রকৃতির পরিচয় তিনি পেয়েছেন। এ সবের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তার কাঠামো।

প্রতিষ্ঠান কোন রাষ্ট্রনীতিক মতবাদের সমগোত্রীয় নয়

মাহাত্মা গান্ধী সত্য ও অহিংসার পূজারী হিসাবে পরিচিত। এই দুটি আদর্শ তাঁর ব্যক্তিগত ও সমগ্র রাজনৈতিক মতাদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাঁর রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণার মূল ভিত্তি হল অহিংসা নীতি। তাঁর মতে হিংসা হল এক অশুভ শক্তি। হিংসার ভিত্তিতেই বলপ্রয়োগের ঘটনা ঘটে। গান্ধীজি বলপ্রয়োগের নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তার উপর টলস্টয় (Tolstoy)-এর গভীর প্রভাব পড়েছে। মহাত্মার একান্ত সচিব ও জীবনীকার হিসাবে সুবিদিত প্যারেলাল (Pyarelal) মন্তব্য করেছেন ঃ "Tolstoy moulded Gandhiji's whole outlook on life. His views on art, religion and economics....no less than on politics were profoundly influenced by Tolstoy." এই কারণে গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তায় নৈরাজ্যবাদী ধারণার অস্তিত্ব দেখা যায়। তা ছাড়া গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তার উপর থোরো (David Thoreau)-র প্রভাবও কম নয়। ১৯০৮ সালে লিখিত 'হিন্দ সরাজ' গ্রন্থে মহাত্মার রাষ্ট্র সম্পর্কিত চিন্তার প্রথম প্রকাশ ঘটে।

সত্য ও অহিংসা

মহাত্মার মতে বলপ্রয়োগই হল আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি। সহিংস বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল কেন্দ্রীভূত এবং সুসংগঠিতভাবে হিংসা ও বলপ্রয়োগের মূর্ত প্রকাশ। তিনি বলেছেন ঃ "The state represents violence in a concentrated and organised form. The individual has a soul, but the state is a soulless machine ; it can never be weaned from violence to which it owes its very existence." আধুনিক অমিত শক্তিধর রাষ্ট্রকে তিনি ভয়ের চোখে দেখেছেন। তাঁর মতে এই রাষ্ট্রে মানুষের ব্যক্তিত্বের অপমৃত্যু ঘটে এবং মানব সমাজের সমূহ সর্বনাশ হয়। রাষ্ট্র মানুষের সার্বিক বিকাশের পরিপন্থী। গান্ধীজি বলেছেন ঃ "I look upon an increase in the power of the state with greaest fear, because while although apparently doing good by minimising exploitation, it does the greatest harm to mankind by destroying the individuality which lies at the root of all progress." মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে ভয়ের চোখে দেখেছেন। কারণ রাষ্ট্র ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিনষ্ট করে। অথচ সমাজের যাবতীয় উন্নতি ও বিকাশের মূলে ব্যক্তির ভূমিকাই বর্তমান। ব্যক্তি প্রাণময়, কিন্তু রাষ্ট্র প্রাণহীন। প্রাণহীন রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যক্তিত্বের বিনাশ ঘটিয়ে মানুষের সর্বাধিক ক্ষতি সাধন করে। গান্ধীজির মতানুসারে রাষ্ট্র হল সর্বাধিক সংগঠিত হিংসার অভিব্যক্তি। শারীরিক বলপ্রয়োগ ছাড়াও সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে হিংসার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্র কিন্তু শারীরিক বলপ্রয়োগ সম্ভূত হিংসা প্রয়োগ করে থাকে। রাষ্ট্রীয় হিংসা সীমাহীন। এবং এই হিংসার উপরই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। স্বভাবতই হিংসা থেকে রাষ্ট্রের মুক্তি অসম্ভব। সুতরাং রাষ্ট্র হল মানুষের সমাজব্যবস্থার পক্ষে অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর একটি প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র শারীরিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বুদ্ধি ও সততায় শ্রেষ্ঠ নয়। গান্ধীজি ঐতিহাসিক, নৈতিক, দার্শনিক, অর্থনীতিক, রাজনীতিক প্রভৃতি সকল দিক থেকেই রাষ্ট্রের উপযোগিতার বিষয়টিকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

রাষ্ট্রের বিরোধিতা

তাঁর মতানুসারে হিংসা ও শোষণের যন্ত্র রাষ্ট্র মানুষের সেবা ও আত্মত্যাগের আদর্শ ও মানসিকতাকে ধ্বংস করে দেয়। রাজনীতিক কর্তৃপক্ষের বাধ্যতামূলক প্রকৃতি মানবিক কাজকর্মের নৈতিক মূল্যকে অগ্রাহ্য করে। তার ফলে নৈতিক মূল্যবোধের অপমৃত্যু ঘটে। মানবিক সচেতনতা ও বিবেকবোধ থেকে যে মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র তাকে ধ্বংস করে। গান্ধীজির অভিমত অনুযায়ী শ্বেতাঙ্গদের সামরিক শাসন বা কৃষ্ণাঙ্গদের জঙ্গী বিধি-ব্যবস্থা ক্ষতিকারক। এই সকল কারণে গান্ধীজি রাষ্ট্র-বিরোধী। বস্তুত গণ-মুক্তির স্বার্থে গান্ধীজি রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছেন।

মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিসত্তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে ব্যক্তিই হল কর্তৃত্ব ও মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু। সমাজের মৌলিক উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির নৈতিক বিকাশ সাধন। ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই কর্তৃত্বের বিকাশ ও প্রয়োগের কথা বলা হয়। অতএব ব্যক্তি ব্যতিরেকে সমাজের অবশিষ্ট আর কিছু থাকে না। ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে রাষ্ট্র ও তার ভূমিকা প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত সার্বভৌম শক্তির ধারণাকে তিনি সমর্থন করেন নি। গান্ধীজি জনগণের সার্বভৌমিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তা পরিপূর্ণ নৈতিক কর্তৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। রাষ্ট্র সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত জনসাধারণের কাছে কেবল সীমাবদ্ধ আনুগত্য পেতে পারে। এতে নৈরাজ্যের আশঙ্কা আছে। তবুও গান্ধীজি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ রোধ করা করার জন্য এই মত পোষণ করেছেন। গান্ধীজির মতানুসারে জনগণই হল মূল, রাষ্ট্র ফল মাত্র। মূলটি যদি সুমধুর হয়, ফল সুমিষ্ট হবে। মহাত্মা বলেছেন : "People are the roots, the state is fruit. If the roots are sweet, the fruits are bound to be sweet." মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রের চরম সার্বভৌমিকতার বিরোধিতা করেছেন। এই বিরোধিতার পিছনে বিবিধ কারণ বর্তমান। এই বিবিধ কারণ হল : (১) গান্ধীজি জনসাধারণের নৈতিক সার্বভৌমত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আইনানুগ সার্বভৌমিকতার সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে তিনি জনসাধারণের নৈতিক সার্বভৌমিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (২) গান্ধীজি মানুষের অভ্যন্তরীণ ও নীতিগত বিবেকবোধের শ্রেষ্ঠত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি রাষ্ট্রের সংগঠিত শক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করেন নি। (৩) সর্বোপরি গান্ধীজি পার্থিব কর্তৃত্বের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের প্রাধান্যের উপর জোর দিয়েছেন।

ব্যক্তিসত্তার গুরুত্ব

গান্ধীজির মতে রাষ্ট্র নিজেই নিজের লক্ষ্য হতে পারে না। রাষ্ট্র হল সমাজের সকলের সর্বাধিক মঙ্গল বিধানের উপায়বিশেষ। রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বকে তিনি ব্যক্তিজীবনের বিকাশের শর্ত হিসাবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন : "(The state is) Not an end in itself but as one of the means of enabling people to better their condition in every department of life." রাষ্ট্রকে কোন পবিত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্যমান্য করার কারণ নেই। রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণ সাধনের একটি উপায় মাত্র। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কোন রকম অপপ্রয়োগ ঘটলে ব্যক্তির নৈতিক অধিকার আছে অহিংস ও সত্যাগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইনকে প্রতিরোধ করার। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের বিরোধী আইনকানুন অমান্য করা গান্ধীজির মতে নাগরিকের অধিকার ও পবিত্র কর্তব্য। তবে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কাকে এড়ানোর জন্য প্রতিরোধের পদ্ধতি হবে পুরোপুরি অহিংস।

রাষ্ট্র সকলের সর্বাধিক মঙ্গলের শর্ত

রাষ্ট্রের সদর্থক ভূমিকাকে গান্ধীজি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন নি। সুসংগঠিত একটি শাসনব্যবস্থার সাহায্যে সমাজের প্রতি ন্যায়সঙ্গত কর্তব্য সম্পাদন রাষ্ট্রের কাজ। এ ধরনের শাসনব্যবস্থার প্রতি মানুষ আনুগত্য দেখাবে। মানুষের কল্যাণে সম্পাদিত রাষ্ট্রের সকল কাজকর্মকে গান্ধীজি স্বাগত জানিয়েছেন। তবে এ পথে রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যক্তির স্বাধীনতার পরিপন্থী হলে তা প্রতিরোধ করতে হবে। রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী হওয়ার আশঙ্কা আছে। রাষ্ট্রকে সংযত করবে সমাজ। রাষ্ট্র-স্বৈরাচারের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে না পারলে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত। মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে রাষ্ট্র কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নয়। আগামী দিনের সমাজে উপনীত হওয়ার উপায় হল রাষ্ট্র। সমাজের উর্ধ্বে রাষ্ট্র নয়। সমাজের মধ্যেই রাষ্ট্র অবস্থিত। রাষ্ট্র হল একটি রাজনীতিক সংস্থা। মানুষই এই সংস্থাটিকে সৃষ্টি করেছে। মহাত্মা গান্ধী উদ্দেশ্য ও উপায় অর্থাৎ লক্ষ্য ও পথের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের কথা বলেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে অশুভ পথে শুভ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মত গান্ধীজি রাষ্ট্রের কার্যাবলীর পরিধিকে সীমিত করার পক্ষপাতী। তাঁর মতে রাষ্ট্রের কার্যাবলীর মধ্যে শুভ বা পবিত্র কিছু নেই। তাঁর ধারণা মানুষের দুর্বলতার জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে রাষ্ট্রের অধিকাংশ দায়িত্বকে ন্যস্ত করতে চেয়েছেন। বলপ্রয়োগমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা কম শক্তি প্রয়োগ করে তার কাজ সম্পাদন করবে। গান্ধীজির দৃঢ় ধারণা রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি মানুষের মঙ্গলের

পরিবর্তে অমঙ্গলকেই ডেকে আনে। তিনি বলেছেন : "I look upon the increase in the power of the state with the greatest fear, because although while apparently doing good by minimising exploitation, it does the greatest harm to mankind by destroying individuality, which lies at the root of all progress." এই কারণে গান্ধীজি রাষ্ট্রের উপর ন্যূনতম কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করার পক্ষপাতী। তিনি ডেভিড থোরোকে অনুসরণ করে বলেছেন: ".....that government is best which governs least." এই সমস্ত কারণে ড. বিনয় সরকার, উডকক (George Woodcock), ড. গোপীনাথ ধাওয়ান (Dr. Gopinath Dhawan) প্রমুখ গান্ধীজিকে নৈরাজ্যবাদী বলে অভিহিত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা গান্ধীজির উপর টলস্টয়ের সুস্পষ্ট প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত বিচারে গান্ধীজিকে নৈরাজ্যবাদী বলা যায় না। ড. বিনয় বিহারী মজুমদার, স্প্রাট্ (P. Spratt), ড. পাওয়ার (Dr. Power) প্রমুখ চিন্তাবিদ গান্ধীজিকে নৈরাজ্যবাদী বলার বিরোধী।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি

মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে রাষ্ট্র হল প্রচলিত বস্তুবাদী সভ্যতার প্রতীক। সরকার, পার্লামেন্ট, আদালত প্রভৃতি হল রাষ্ট্রের এজেন্ট। এগুলিকে গান্ধীজি অগ্রগতির উপায় হিসাবে গণ্য করেন নি। তিনি পার্লামেন্টের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি পার্লামেন্টকে 'বন্ধ্যা নারী' হিসাবে অভিহিত করেছেন। কারলাইল (Carlyle) -এর মত তিনি 'বকম বাজির আখড়া' (talking shop) হিসাবে উপহাস করেছেন। তাঁর মতানুসারে পার্লামেন্ট হল ভড়ংবাজ ও ধান্দাবাজদের এক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি কখনই নিজে থেকে মানুষের কোন মঙ্গল করে নি। কারণ সংসদ সব সময় অস্থিরচিত্ততা ও অনিশ্চয়তা থেকে ভোগে। সংসদের সমালোচনা করতে গিয়ে *হিন্দ স্বরাজ* শীর্ষক রচনায় গান্ধীজি বলেছেন: "Today it is under Mr. Asquith, tomorrow it may be under Mr. Balfour.... what is done today may be undone tomorrow. It is not possible to recall a single instance in which finality can be predicted for its work." রাজনীতি আর সরকারের চরম সমালোচনা করে তিনি মন্তব্য করেছেন যে রাজনীতিবিদেরা পুরোপুরি স্বার্থচিন্তা আর সংরক্ষণে ব্যস্ত। সেইমত জনমত তারা তৈরী করে আর নিজেদের কাজে লাগায়। জনপ্রতিনিধিদের ও জনগণের মাঝখানে থাকে এক জটিল আইনী বেড়াজাল, জনগণ আর তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে গড়ে ওঠে দুরতিক্রম্য ফাঁক।

সংসদীয় গণতন্ত্রের সমালোচনা

মহাত্মা গান্ধী একেবারে নতুন ধরনের এক সামাজিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আদর্শ সমাজব্যবস্থায় রাজপুত্র ও দেউলিয়ার মধ্যে, ব্যারিস্টার ও ঝাড়ুদারের মধ্যে কোন রকম বৈষম্য থাকবে না। এমনকি পথের কুকুরও ন্যায়বিচার পাবে। এই সমাজ হবে শ্রেণীহীন। এই সমাজে হিংসার প্রতীক রাষ্ট্রের কোন স্থান নেই। এক আদর্শ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে গিয়ে গান্ধীজি রাষ্ট্রবিহীন গণতন্ত্র (Stateless Democracy)-এর কথা বলেছেন। অহিংস নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণহীন সমাজের সৃষ্টি হবে। কারণ সমাজ থেকে হিংসা দূর করতে পারলে সবরকম শোষণের অবসান হবে। এ রকম অহিংস সমাজে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা থাকবে, সাম্যনীতি বাস্তবে রূপায়িত হবে এবং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। মহাত্মা গান্ধী ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সাম্যভিত্তিক শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলেছেন। প্যারেলাল (Pyarelal) মন্তব্য করেছেন : "Gandhiji was a firm believer in a classless, egalitarian society in which there would be no distinction of rich and poor, high and low." গান্ধীজির এই সাম্যভিত্তিক শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজ অহিংস নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি শ্রেণী-সংগ্রামের পথ পরিহার করে শ্রেণী সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করতে বলেছেন। এই সমাজব্যবস্থায় কোন রাষ্ট্র থাকবে না এবং কোন রাজনৈতিক ক্ষমতাও থাকবে না। রাষ্ট্রবিহীন এই অহিংস গণতন্ত্রই হল গান্ধীজির ভাষায় রামরাজ্য। গান্ধীজির মতানুসারে রামরাজ্য হবে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব। এই রাজত্বে জনগণের নৈতিক কর্তৃত্বের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই রাজত্বে হিংসার কাঠামো হিসাবে রাষ্ট্রের অবসান ঘটবে। গান্ধীজির রামরাজ্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক ভর্মা (V. P. Varma) তাঁর *Political Philosophy of Mahatma Gandhi and Sarvodaya* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "Ramrajya means the realisation of unniversal peace and humanitarian ethics...The realisation of the Kingdom of God would depend however, on a sincere faith in the supreme spirit by millions ...this Ramrajya will be more cohesive than the formal bonds of legal organisation." এখানে সমাজ-জীবন স্ব-নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হবে। স্ব-আরোপিত বিধিবিধান, নৈতিক মূল্যবোধ এবং সংযমই হবে এই সমাজব্যবস্থার চালিকা শক্তি। এখানে প্রত্যেকে তার নিজের প্রভু। এমনভাবে

রামরাজ্য

প্রত্যেকে নিজেকে পরিচালিত করবে যাতে অপরের ক্ষেত্রে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা দেখা না দেয়। কোন রকম ক্ষমতার দ্বন্দ্বের প্রশ্ন এই আদর্শ ব্যবস্থায় দেখা দেবে না। এখানে সকলের জন্য একই প্রকার স্বাধীনতা থাকবে। এই সমাজব্যবস্থায় সকল ক্ষেত্রে সাম্য ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বজায় থাকবে।

মহাত্মা গান্ধী মার্কসীয় দর্শনের মত রাষ্ট্রের একেবারে অবলুপ্তির কথা বলেন নি। তাঁর অভিমত অনুযায়ী সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অব্যাহত থাকবে। কিন্তু এই রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণরূপে এক অহিংস সংগঠন। এবং এই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, ভারী শিল্প ও পরিবহণ ব্যবস্থা, বিশাল আকার-আয়তনের যন্ত্রপাতি, সৈন্যবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আমলাবাহিনী, বড় বড় হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমাজে থাকবে। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ; ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্বের বিনাশ সাধন নয়। জনসাধারণের নৈতিক কর্তৃত্বের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য কায়েম হবে। হিংসার কাঠামো হিসাবে রাষ্ট্রের অবসান ঘটবে।

গান্ধীজির রাষ্ট্র

গান্ধীজির রাষ্ট্র পরিকল্পনার দুটি মূল কথা হল বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বাবলম্বন। গান্ধীজির এই রামরাজ্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গ্রামভিত্তিক হবে। সত্যাগ্রহী গ্রামগুলি সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে গঠিত হবে। এই সমস্ত গ্রামের সমবায়ই হল গান্ধীজির পরিকল্পিত রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রের বাস্তব রূপ। গান্ধীজির স্বপ্নের 'রামরাজ্য' বলতে রাষ্ট্রবিহীন অহিংস গণতন্ত্রকেই বোঝায়। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে এই সংগঠন গড়ে উঠবে। সমাজজীবনে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সাম্য বর্তমান থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পরিশ্রম (bread labour) করবে। প্রত্যেকে সামর্থ্য অনুসারে সমাজের জন্য কাজ করবে। তবে এ রকম এক আদর্শ ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা এ বিষয়ে গান্ধীজি সন্দিহান ছিলেন।

বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বাবলম্বন

পঞ্চায়েতী রাজের ভিত্তিতে এই বিকেন্দ্রীভূত সমাজব্যবস্থা পরিচালিত হবে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্ব-শাসিত এই গ্রামীণ সমাজ হবে স্ব-নির্ভর বা স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামীণ প্রশাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা এই গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে থাকবে। গান্ধীজির মতানুসারে অহিংস সমাজে কোন কেন্দ্রীকরণ থাকতে পারে না। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়াও গান্ধীজি তাঁর আদর্শ সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন। তিনি অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সম্পদ-সামগ্রীর বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তির নৈতিক ও মানসিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কথা বলেছেন। গান্ধীজি বলেছেন ঃ "আমার কল্পনায় গ্রামস্বরাজ হল একটি পরিপূর্ণ প্রজাতন্ত্র।" তিনি এর নাম দিয়েছেন গ্রামীণ প্রজাতন্ত্র। এই প্রজাতন্ত্রগুলির সমবায়েই গঠিত হবে রাষ্ট্র। মহাত্মা গান্ধী ***Young India*** শীর্ষক রচনায় বলেছেন ঃ "By Ramrajya I do not mean Hinduraj. I mean by Ramrajya divineraj, the kingdom of God... the ancient ideal of Ramrajya is one true of democracy."

গান্ধীজি প্রেম-প্রীতির মাধ্যমে সামাজিক সাম্য ও সংহতি সংরক্ষণের কথা বলেছেন। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি আধুনিকীকরণ ও বৃহদায়তন ব্যবস্থার বিরোধী। তিনি বৃহদায়তন শিল্প, ব্যাপক উৎপাদন, ভারী যন্ত্রপাতি, আধুনিক বৃহৎ শহর, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রভৃতির বিরোধিতা করেছেন। তিনি কুটির শিল্প ও শ্রমনিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থার পক্ষপাতী। তাঁর মতে মানুষ, পশু ও প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য থাকা দরকার।

মহাত্মা গান্ধী নৈরাজ্যবাদীদের মত এক নতুন ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। এই নতুন সমাজব্যবস্থায় সকলের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত হবে। এই সমাজে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কোন রকম অপব্যবহার কোন ক্ষেত্রে ঘটলে তা প্রতিহত করার সামর্থ্য মানুষের থাকবে। তবে এই প্রতিবাদ হবে অহিংসা ও সত্যাগ্রহের পথে। এ ধরনের এক সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে কি না সে বিষয়ে গান্ধীজির মনে সন্দেহ-সংশয় ছিল। এমন আশংকা তিনি প্রকাশ করেছেন যে এ ধরনের এক আদর্শ সমাজজীবন হয়ত বাস্তবে অধরাই থেকে যাবে। তবে এ রকম আদর্শ সমাজজীবনের পথের সন্ধান তিনি দিয়েছেন। জি. এন. ধাওয়ান (G.N. Dhawan) তাঁর *The Political Philosophy of Mahatma Gandhi* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ "(Gandhiji) indicates the direction rather than the destination, the process rather than the consummation. The structure of the state that will emerge as a result of the non-violent revolution will be a compromise, a via media, between the ideal non-violent society and the facts of human nature."

বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আশঙ্কা

সমালোচনা (Criticism) ঃ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তার বিরূপ সমালোচনা করা হয়।

(১) অনেকের মতে রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণা স্ব-বিরোধী। একদিকে তিনি রাষ্ট্রবিহীন গণতন্ত্রের কথা বলেছেন, আবার অপরদিকে রাষ্ট্রের হাতে সর্বাপেক্ষা কম ক্ষমতা প্রদানের তত্ত্ব প্রচার করেছেন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও অপরাধপ্রবণতা হ্রাস করার ক্ষেত্রেও তিনি রাষ্ট্রের ইতিবাচক ভূমিকার ইঙ্গিত দিয়েছেন। অর্থাৎ গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে স্ব-বিরোধিতা বর্তমান।

স্ব-বিরোধী

(২) গান্ধীজির 'রামরাজ্য' এক অবাস্তব পরিকল্পনা হিসাবে সমালোচনা করা হয়। সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা বা গান্ধীজির পরিকল্পিত রামরাজ্য নিতান্তই কল্পলোকের বিষয়। রামরাজ্যের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করা কার্যত অসম্ভব। বর্তমান বিশ্বের অতিমাত্রায় জটিল প্রকৃতির সমস্যাদির মোকাবিলার ক্ষেত্রে গান্ধীজি পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য। বস্তুত তিনি নিজেও এ রকম সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন।

রামরাজ্য অবাস্তব

(৩) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত গান্ধীজির মূল্যায়ন একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট। নৈরাজ্যবাদীদের মত তিনি রাষ্ট্রকে শোষণ-পীড়নের হাতিয়ার হিসাবে দেখেছেন। রাষ্ট্রের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা আছে। এ কথা ঠিক। তেমনি এ কথাও ঠিক যে, রাষ্ট্র মানুষ ও মানবসমাজের মঙ্গলের জন্যও কাজ করে। রাষ্ট্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী। অনুরূপভাবে আবার রাষ্ট্র মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্যও কাজ করে। বস্তুত সভ্য ও সুস্থ সমাজ জীবনের স্বার্থে রাষ্ট্রের ভূমিকার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

একদেশদর্শী

(৪) গান্ধীজি ব্যক্তিসত্তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি ব্যক্তিকে সমাজের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু সমাজই ব্যক্তির উর্ধ্বে—ব্যক্তি সমাজের উর্ধ্বে নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের সদস্য হিসাবে রাষ্ট্রের সাহায্যেই ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। তা ছাড়া গান্ধীজি ব্যক্তির নৈতিক স্বাধীনতার কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে সমাজ বা রাষ্ট্র নিরপেক্ষভাবে নৈতিক স্বাধীনতার উপলব্ধি ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ত্রুটি

(৫) মানব চরিত্র সম্পর্কিত গান্ধীজির ধারণা অতিমাত্রায় আদর্শবাদী। গান্ধীজি মানব প্রকৃতি প্রসঙ্গে উন্নত ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু বাস্তবে তা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব প্রতিপন্ন হয়। মানুষ সামাজিক ও যুক্তিবাদী ; মানুষের মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রকৃতি বর্তমান। অনুরূপভাবে আবার মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতাও সীমাহীন। মানুষের মধ্যে সদ্ভাব-সম্প্রীতি যেমন আছে, তেমনি মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রবণতাও প্রবল। মহাত্মা গান্ধী একজন আদর্শবাদীর মত মানুষের কেবল সুকুমার বৃত্তিগুলিকেই দেখেছেন এবং তার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানবচরিত্রের হীন দিকগুলিকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। গান্ধীজি মানব প্রকৃতির পরিবর্তনের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আদর্শবাদিতা

(৬) গান্ধীজির অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষণশীলতা দোষে দুষ্ট। এক্ষেত্রে তাঁর মতবাদ আধুনিক উন্নতিশীল শিল্পোন্নত দেশের আর্থিক নীতি ও কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। শিল্পোন্নয়ন ও আধুনিকতা বিরোধী গান্ধীজির অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বর্তমানে সমর্থন করা হয় না। অনেকের মতে গান্ধীজির নীতি মানব-সভ্যতার অগ্রগতির পরিপন্থী। শিক্ষাব্যবস্থা এমনকি চিকিৎসা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও গান্ধীজির উন্নত আধুনিক ব্যবস্থার বিরোধিতা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

রক্ষণশীলতা

(৭) মার্কসবাদীরা রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণার কঠোর সমালোচনা করেন। গান্ধীজির মতে রাষ্ট্র কোন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রতিষ্ঠান নয় এবং রাষ্ট্র কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থসাধন করে না। কিন্তু মার্কসবাদীদের মতে রাষ্ট্র হল শ্রেণী-শাসনের যন্ত্র ; রাষ্ট্রের মাধ্যমে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে শোষণ করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে এবং পুরোপুরি নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তা ব্যবহার করে। গান্ধীজি রাষ্ট্রের এই শ্রেণী-চরিত্রকে অস্বীকার করেছেন।

রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্রকে অস্বীকার

(৮) গান্ধীজি অহিংস আন্দোলনে আস্থাশীল। তিনি অহিংস সংগ্রামে ও সত্যাগ্রহের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী ছিলেন। মার্কসবাদীদের মতানুসারে অহিংস সত্যাগ্রহের মাধ্যমে বুর্জোয়া শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং ক্ষমতা দখল করা অসম্ভব। মার্কসবাদীরা শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বে বিশ্বাসী। আবেদন-নিবেদন বা অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে কোথাও শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন হয় নি। এটা ঐতিহাসিক সত্য। গান্ধীজি কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলন ও কর্মপন্থার বিরোধিতা করেছেন।

শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বকে অস্বীকার

(৯) ধর্মীয় ও নৈতিকতার ভিত্তিতে গান্ধীজি তাঁর রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ধর্ম ও নৈতিকতার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার ফলে গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তায় বাস্তব অবস্থা উপেক্ষিত হয়েছে। এই সমস্ত কারণে সমালোচকদের অন্যতম অভিযোগ হল যে, গান্ধীজির রাজনৈতিক চিন্তা অত্যন্ত অস্পষ্ট।

অস্পষ্ট

উপরিউক্ত বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও গান্ধীজির অনন্য রাষ্ট্রচিন্তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর রাষ্ট্রদর্শন নিপীড়িত মানুষের মুক্তি-চিন্তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার তাৎপর্য ও গুরুত্ব তত্ত্বগতভাবেও বাস্তবে সর্বজনস্বীকৃত। গণতান্ত্রিক শাসনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, গ্রামবাসীদের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি, পরিচ্ছন্ন গ্রামীণ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কারণে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গুরুত্ব আজ আর অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প এবং শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির তাৎপর্য চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে সমাদর লাভ করেছে। ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধী দর্শনের উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলিকে প্রয়োগ ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে পঞ্চায়েতীরাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া বেকার সমস্যা-জর্জরিত ভারতে কুটির শিল্প এবং শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না।

উপসংহার

৭.৩.ঙ. রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য (Difference between Marxian outlook and Gandhiji's out look regarding the state)

গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন দিকগুলি পর্যালোচনা করলে মার্কসীয় দর্শনের কিছু কিছু বিষয়ের সঙ্গে আপাত সাদৃশ্য দেখা যায়। এরই ভিত্তিতে অনেকে মনে করেন যে, মার্কসবাদের সঙ্গে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক সাযুজ্য রয়েছে। সাদৃশ্যমূলক আলোচনা প্রসঙ্গে এঁরা বলেন যে মহাত্মা গান্ধী ও মার্কস উভয়েই রাষ্ট্রবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রসঙ্গে উভয়েরই মত হল যে, রাষ্ট্র একটি শোষণমূলক প্রতিষ্ঠান এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র কাজ করে। তবে মার্কসবাদ ও গান্ধীজির দর্শনের মধ্যে এই ধরনের সাদৃশ্যমূলক আলোচনা অসঙ্গত ও বিভ্রান্তিকর। বস্তুত দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিগত বিষয়ে মার্কসবাদ ও গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে পার্থক্য বর্তমান।

আপাত সাদৃশ্য

(১) গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তা মূলত ধর্ম ও নৈতিকতার দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়েছে। ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাদির বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদী। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মার্কস সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাদির বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন।

দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

(২) রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রসঙ্গে গান্ধীজি ও মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আছে। মার্কসবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হল শ্রেণী-শোষণ ও শ্রেণী-শাসনের হাতিয়ার বিশেষ। মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্রকে গান্ধীজি উপেক্ষা করেছেন। রাষ্ট্র শ্রেণীস্বার্থের ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করে। গান্ধীজি তা মনে করেন না।

রাষ্ট্রের প্রকৃতির প্রশ্নে পার্থক্য

(৩) মার্কসবাদে সর্বহারার বিপ্লবের অপরিহার্যতার কথা বলা হয়। কারণ হিসাবে বলা হয় যে, বুর্জোয়া শ্রেণী কখনই নিজের থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সর্বহারা শ্রেণীকে দেবে না। তাই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে হবে। অর্থাৎ সর্বহারার বিপ্লব অপরিহার্য। কিন্তু গান্ধীজির মতানুসারে বলপ্রয়োগ বা বিপ্লব গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী। তাঁর মতানুসারে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল অনৈতিক ও অন্যায়। গান্ধীজি অহিংস সংগ্রামের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে এই অহিংস উপায়ের মাধ্যমে কাম্য পরিবর্তন সম্ভব।

বিপ্লবের অপরিহার্যতার প্রশ্নে পার্থক্য

(৪) মার্কসীয় দর্শনের দু'টি বড় সূত্র হল ঃ 'সর্বহারার একনায়কত্ব' (Dictatorship of the Proletariat) এবং 'রাষ্ট্রের অবলুপ্তি' (withering away of the state)। মার্কসবাদ অনুসারে বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের জায়গায় সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তারপর শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রেণীশোষণের যন্ত্র রাষ্ট্র অপ্রয়োজনীয় হয়ে আপনা থেকে উবে যাবে। মহাত্মা গান্ধী কিন্তু 'সর্বহারার একনায়কত্ব' ও 'রাষ্ট্রের অবলুপ্তির' তত্ত্বকে স্বীকার করেন নি। তিনি রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপ হিসাবে সত্যাগ্রহী গ্রামসমূহের সমবায়ের কথা বলেছেন।

সর্বহারার একনায়কত্ব ও রাষ্ট্রের অবলুপ্তি গান্ধীজি স্বীকার করেন নি

প্রকৃত প্রস্তাবে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ও গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সাদৃশ্যের অনুসন্ধান নিতান্তই অর্থহীন। উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান।

৭.৩.চ. স্বরাজ সম্পর্কিত গান্ধীজির ধারণা (Gandhi's Concept of Swaraj)

স্বরাজ সম্পর্কিত ধারণা অধিকতর অর্থবহ। গান্ধী-দর্শনে স্বরাজ সম্পর্কিত ধারণার ব্যঞ্জনা বিশেষভাবে ব্যাপক। প্রাথমিকভাবে স্বরাজ বলতে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে জাতির মুক্তিকে বোঝায়। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাজ হল বিদেশী ব্রিটিশ শাসনের অবসান। সমকালীন ভারতের জাতীয়তাবাদী বিশিষ্ট নেতা বালগঙ্গাধর তিলক উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'স্বরাজ হল আমাদের জন্মগত অধিকার'। এই স্লোগান ভারতবাসীর মনে উল্লেখযোগ্য উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে।

সাধারণ অর্থ

মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজ সম্পর্কিত সমগ্র ধারণা বিশেষ একটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়টি হল অহিংসা ও সত্যাগ্রহের পথে স্বাধীনতা অর্জন। স্বরাজের ধারণা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেছেন সম্ভব হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ এবং প্রয়োজন হলে এর বাইরে স্বাধীনতা অর্জন। তিনি বিদেশী শাসনকে শয়তানিপূর্ণ বলে সুস্পষ্টভাবে সমালোচনা করেছেন। আবার ভারতের স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা বা সহাবস্থানের ব্যাপারেও তাঁর সম্মতিসূচক অনুমোদন ছিল। বস্তুত ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালিত হওয়ার প্রাক্কালে 'স্বরাজ' শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হত। স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নেতারা প্রায়শই 'স্বরাজ' কথাটি প্রয়োগ করতেন। কিন্তু 'স্বরাজ' কথাটির সর্ববিধ ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সকলে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। এই সময় গান্ধীজিও 'স্বরাজ'-এর সম্পূর্ণ অর্থ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন নি। অনেকের অভিমত অনুসারে অর্থের অস্পষ্টতা বা ব্যঞ্জনার দ্ব্যর্থতার কারণেই সুচিন্তিতভাবেই স্বরাজ শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই শব্দটির দ্বারা ব্রিটিশ শাসনের সম্পূর্ণ অবসান বা ভারত ও ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা হয় নি। এই শব্দটির দ্বারা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে থেকে বা এই সংগঠনের বাইরে গিয়ে স্বাধীনতার কথা বোঝান যেত। মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ "It (Swaraj) means a state such that we can maintain our separate existence without the presence of the English. If it is to be a partnership, it must be a partnership at will." পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে 'স্বরাজ' শব্দটির ধারণাগত অস্পষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতানুসারে অধিকাংশ ভারতীয় জননেতা স্বরাজ বলতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার থেকে কম কিছুকে বুঝতেন। গান্ধীজিও বিষয়টিকে আগাগোড়া অস্পষ্ট রেখে গেছেন। স্বরাজ-এর ধারণাটিকে তিনি কখনই সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন নি। পণ্ডিত নেহরু বলেছেন ঃ "It was obvious that to most of our leaders Swaraj meant something much less than independence. Gandhiji was dilightfully vague on the subject and he did not encourage clear thingking about it either."

ধারণাগত অস্পষ্টতা

মহাত্মা গান্ধী অধিকতর উন্নত মানের 'হোমরুল' উদ্ভাবনের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি গ্রাম-সমাজের 'হোমরুল' বা স্বরাজকেই অধিকতর পরিপূর্ণভাবে ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী গ্রাম-সমাজের উপর অভিশপ্ত পশ্চিমী আধুনিক সভ্যতার প্রভাব পড়ে নি। মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে স্বরাজ বলতে ভারতে ব্রিটেনের রাজনীতিক কাঠামোকে আমদানি করাকে বোঝায় না। 'হিন্দ স্বরাজ'-এর মধ্যে গান্ধীজির স্বরাজ সম্পর্কিত ধারণা নিহিত আছে। মহাত্মার মতানুসারে বস্তুগত সুখ লাভ বা ক্ষমতার হস্তান্তর 'হিন্দ স্বরাজ' নয়। 'সকলে না পাওয়া পর্যন্ত আমরাও নেব না'—এই চেতনা আমাদের মধ্যে এলে স্বরাজ আসবে। সকলের জন্য সকলের সমাজ হল স্বরাজ। এই সমাজে জাত-অজাত, সক্ষম-অক্ষম, ধনী-নির্ধন এ রকম কোন ভেদাভেদ থাকবে না। গ্রাম স্বরাজের আদর্শ স্থাপনের স্বার্থে জরুরী হল আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সকলের কর্মসংস্থান প্রভৃতি। এই উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতি, দেশীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি আবশ্যক। তা হলে দেশের উন্নতি সাধনে দেশবাসীর সামর্থ্য, গুণগত যোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার বিকাশ ঘটবে। হিন্দুর রাজত্ব হিন্দ স্বরাজ নয়। এ হল ন্যায়ের রাজত্ব, সকলের রাজ্য। এই স্বরাজের উদ্দেশ্য হল বৈদেশিক শাসনের অপসারণ, নৈতিকতার বিকাশ ও বিস্তার, পূর্ণ আর্থনীতিক সহযোগিতা, সামাজিকতা প্রভৃতি। তবে কিছু সংখ্যক মানুষ ক্ষমতার অধিকারী হলে তাকে স্বরাজ বলা যায় না। ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধে প্রতিটি মানুষের সামর্থ্য থাকা দরকার। তবেই স্বরাজের সৃষ্টি হতে পারে।

হিন্দ স্বরাজ

মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজ সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে অধিবিদ্যক অর্থও নিহিত আছে। স্বরাজ হল এক আদর্শ সমাজে মানবজীবনের এক কাল্পনিক অবস্থা। এই অবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে প্রত্যেক মানুষের সামর্থ্য থাকবে। স্বরাজ নিছক একটি রাজনীতিক বা আর্থনীতিক আদর্শ নয়। এ হল নৈতিক শক্তি-সামর্থ্যের

অভিব্যক্তি। স্বরাজ হল এক সুশৃঙ্খল সামাজিক অবস্থা। এর মধ্যে অহংবোধের বা ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণতা থাকবে না। কারণ অহংবোধের সংকীর্ণতাই সমাজে সংঘাত ও উত্তেজনাপূর্ণ বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি করে। পরিপূর্ণ সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের রাজত্বই হল স্বরাজ। এ দিক থেকে বিচার করলে গান্ধীজির স্বরাজ হল বহুলাংশে রামরাজ্যের সমগোত্রীয় বা সমার্থক। স্বরাজেরই পরিপূর্ণ পরিণতি হল রামরাজ্য। জনসাধারণের স্বরাজ হল রামরাজ্য ; স্বরাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল রামরাজ্য। রামরাজ্য হল অহিংসাত্মক স্বরাজ, রামরাজ্য হল ধর্মের রাজত্ব।

স্বরাজ ও রামরাজ্য

৭.৩.ছ. আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কিত গান্ধীজির ধারণা (Gandhi's Concept of International)

মহাত্মা গান্ধীর জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল অত্যন্ত উন্নত মানের। জাতির জনক গান্ধীজি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় জাতীয়তাবাদী নেতা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন বিশ্ববন্দিত এক আন্তর্জাতিকতাবাদী। মহাত্মা গান্ধী জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশ্ব-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। জাতীয়তাবাদী মনোভাব মহাত্মার রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। তিনি সমর্থন করেন নি। তিনি মানব সভ্যতার বিকাশের উপর জোর দিয়েছেন। এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি সুস্থ জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এদিক থেকে বিচার করলে মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিকতার তত্ত্ব প্রচার করেছেন। তবে উগ্র বা বিকৃত জাতীয়তাবাদ, অর্থাৎ জাতি বিদ্বেষকে তিনি অন্ধ আবেগতাড়িত আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেছেন। কারণ এ ধরনের জঙ্গী জাতীয়তাবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের মধ্যে অনভিপ্রেত কৃত্রিম ভেদাভেদের প্রাচীর খাড়া করে দেয়। এবং জঙ্গী জাতীয়তাবাদ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বাহুবল প্রয়োগের পক্ষপাতী। মহাত্মার মতানুসারে জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোন দোষ নেই, দোষ আছে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও অমিশুকতার মধ্যে। তিনি *Young India*-তে বলেছেন ঃ "It is not nationalism that is evil, it is the narrowness, selfishness, exclusiveness which is the leave of modern nations, that is evil." তাঁর মতানুসারে একজন ব্যক্তি একই সময়ে একযোগে তার প্রতিবেশীদের এবং মানবজাতির সেবা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র শর্ত হল এই যে প্রতিবেশীদের প্রতি এই সেবা স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট হবে না। গান্ধীজির জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্যে আত্মত্যাগের আদর্শ নিহিত আছে। মহাত্মার মতানুসারে মানুষ তার জাতি বা জাতীয় জনসম্প্রদায়ের গণ্ডীর উর্ধ্বে উঠে সমগ্র মানব জাতির জন্য ভাবনা-চিন্তা করবে। আত্মত্যাগের সার কথা হল, জাতিমাত্রেই অপরের দুঃখ-দুর্দশার সময় সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসবে।

উদার জাতীয়তাবাদী তথা আন্তর্জাতিকতাবাদী

মহাত্মা গান্ধী শান্তি ও সহযোগিতাপূর্ণ এক দুনিয়ার কথা বলেছেন। এই দুনিয়ায় থাকবে অহিংসা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। এই সংগঠন গড়ে উঠবে অহিংসা নীতির উপর আস্থাশীল রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে। এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি অহিংসা নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হবে। পৃথিবীর সকল মানবগোষ্ঠীর জন্য সাম্য ও স্বাধীনতা এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি স্বীকার ও সংরক্ষণ করবে। এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের জন্য এই অহিংস আন্তর্জাতিক সংগঠনটি সাম্রাজ্যবাদ, জাতি-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ প্রভৃতি মানবতার সকল শত্রুর বিনাশের ব্যাপারে যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করবে। এই সংগঠনের মধ্যে থাকবে একটি অহিংস আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী। এই পুলিশ বাহিনীর কাজ হবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানবগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে বিক্ষিপ্ত বিবাদ-বিসংবাদ রোধ করা। এইভাবে এই অহিংস আন্তর্জাতিক সংগঠনের আওতায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নির্বিঘ্ন ও সুখ-শান্তিপূর্ণ মানবজীবন সম্ভব হবে। গান্ধীজি বিচ্ছিন্নভাবে রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতার কথা বলেননি। পরস্পর বিবাদমান স্বাধীন রাষ্ট্রের কথাও তিনি বলেন নি। তিনি বন্ধুভাবাপন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। গান্ধীজি বলেছেন ঃ "Isolated independence is not the goal of world states. The better mind of the world desires today not absolutely independent states warring one against another, but a federation of friendly independent states."

অহিংস আন্তর্জাতিক সংগঠন

মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গেও অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি বিচ্ছিন্নভাবে ভারতের স্বাধীনতা কামনা করেন নি। তিনি সমগ্র মানবজাতির মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করেছেন। সমস্ত মানবজাতির কল্যাণে নিজের দেশের সম্পদ-সামগ্রীকে ব্যবহার করা সম্ভব হবে, এই উদ্দেশ্যে গান্ধীজি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "...a country has to be free in order that it may die, if necessary, for the benefit of the world." মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রচিন্তার মহত্ত্ব এই বিশ্বজনীন চিন্তার মধ্যে নিহিত আছে।

৭.৩জ. গান্ধীজির নৈরাজ্যবাদী ধারণা (Gandhiji's Concept of Anarchism)

ফরাসী বিপ্লবের যুগে একটি ইউরোপীয় মতবাদ হিসাবে আধুনিক নৈরাজ্যবাদের আবির্ভাব ঘটে। এ হল এক রাষ্ট্রবিরোধী মতবাদ। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অমানবিক শোষণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে নৈরাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয়। নৈরাজ্যবাদী চিন্তাবিদ্‌দের অভিমত অনুযায়ী মানবজীবনে বিবিধ অন্যায়-অসাম্য, শোষণ-পীড়ন ও বিশৃঙ্খলা বর্তমান। এবং এসবের মূলে আছে রাষ্ট্র। মানবজীবনের এই সমস্ত প্রতিকূলতার মূল কারণ হল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। মানবজীবনের যাবতীয় পাপের প্রতীক হল এই রাষ্ট্র। এই কারণে নৈরাজ্যবাদীরা মানুষের যথার্থ মুক্তির স্বার্থে রাষ্ট্রহীন সমাজ গড়ে তোলার কথা বলেন। বিশুদ্ধ নৈরাজ্যবাদ বলতে রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থাকে বোঝায়। এ ধরনের সমাজব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে স্বনিয়ন্ত্রিত সম্পর্কের সৃষ্টি হবে। আইন প্রণয়ন, প্রশাসন পরিচালনা, আর্থনীতিক কাজকর্ম পরিচালনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে জনসাধারণ সরাসরি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। সমাজ শাসিত হবে সমবায়িক পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে। স্বভাবতই সৈন্যবাহিনী, আরক্ষা বাহিনী, আমলাতন্ত্র প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। সুতরাং বিশুদ্ধ নৈরাজ্যবাদ হল রাষ্ট্রহীন সমাজ বা রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্র। নৈরাজ্যবাদী চিন্তাবিদ্‌দের মূল উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যতে রাষ্ট্রহীন সমাজ সৃষ্টি করা কিন্তু এই উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার উপায় পদ্ধতি সম্পর্কে নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে নৈরাজ্যবাদীরা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। বস্তুত নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে এই মতানৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে নৈরাজ্যবাদের দ্বিবিধ ভাষ্য পরিলক্ষিত হয়। নৈরাজ্যবাদের একটি ভাষ্য হল দার্শনিক নৈরাজ্যবাদ এবং আর একটি ভাষ্য হল বৈপ্লবিক নৈরাজ্যবাদ। দার্শনিক নৈরাজ্যবাদীরা ভবিষ্যতের রাষ্ট্রহীন সমাজ গড়ে তোলার জন্য মানুষের নৈতিক শক্তিকে উজ্জীবিত করার পক্ষপাতী। দার্শনিক নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে খ্রীস্টান নৈরাজ্যবাদী লিও টলস্টয় (Leo Tolstoy), টমাস পেইন (Thomas Paine), উইলিয়াম গডউইন (Willium Godwin) প্রভৃতি চিন্তাবিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদীরা বৈপ্লবিক পথে বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থার বিনাশ সাধন করে রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে মাইকেল বাকুনিন (Bakunin) ও আলেক্‌জাণ্ডার ক্রপোতকিন (Kropotkin)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নৈরাজ্যবাদী সমাজের ধারণা

মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রের ভূমিকার বিরোধিতা করেছেন। গান্ধীজির অভিমত অনুযায়ী রাষ্ট্র হল হিংসার প্রতীক, অন্যায়-অবিচারের প্রতিমূর্তি। ব্যক্তি-মানুষের বিকাশের পথে রাষ্ট্র প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। সামরিক শক্তির সাহায্যে পরিচালিত রাষ্ট্র হল হিংসা ও পীড়নমূলক শক্তির অভিব্যক্তি। সুতরাং এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অব্যাহত রেখে হিংসার অবসান অসম্ভব। হিংসাত্মক এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটিকে গান্ধীজি পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন। রাষ্ট্রের অবসানের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের রাষ্ট্রহীন সমাজ গড়ে উঠবে। গান্ধীজির মতানুসারে ভবিষ্যতের এই রাষ্ট্রহীন সমাজে বলপ্রয়োগ থাকবে না। এই সমাজে সবকিছু অহিংসা পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজ পাবে। এই সমাজ নৈতিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। নৈতিক কর্তৃত্বই হবে ভবিষ্যতের এই নৈরাজ্যবাদী সমাজের পরিচালিকা শক্তি। ভবিষ্যতের এই সমাজকে বলা হয়েছে 'আলোকপ্রাপ্ত নৈরাজ্য' বা 'সুশৃঙ্খল নৈরাজ্য' (Enlightened Anarchy or Ordered Anarchy)। একেই গান্ধীজি বলেছেন রামরাজ্য। গান্ধীজির মূল দার্শনিক চিন্তার অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ হল তাঁর নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারা। এই কারণে গান্ধী-দর্শনের ব্যাখ্যাকারকদের মধ্যে অনেকে গান্ধীজিকে 'দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী', 'শান্তিবাদী নৈরাজ্যবাদী', 'ধর্মীয় নৈরাজ্যবাদী' প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রবিমুখতার মধ্যে লিও টলস্টয়ের চিন্তাধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

গান্ধীজির রাষ্ট্রবিমুখতা

মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রচিন্তা ছিল বহুলাংশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। গান্ধীজির এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যান-ধারণা চূড়ান্ত বিচারে নৈরাজ্যবাদী সমাজভাবনায় পরিণত হয়েছে। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ ও সর্বোদয় ধারণার মধ্যে ভবিষ্যৎ মানবসমাজের রূপরেখার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমাজে দুটি উপাদানের উপস্থিতি অপরিহার্য বিবেচিত হয়। এই সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ থাকবে না এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিক বা ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যক্তি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে তিনি এমন এক উচ্চতায় উন্নীত করার পক্ষপাতী ছিলেন যে, রাষ্ট্র বাস্তবে একটি অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে গান্ধীজি কার্যত গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী রাষ্ট্র হল অন্যায় ও অযৌক্তিকতার অভিব্যক্তি। এই রাষ্ট্রের কাছে আনুগত্য প্রদর্শন ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব পরস্পর-বিরোধী। রাষ্ট্র ক্ষমতাকে নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে চায়। রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভবন ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে। তার ফলে সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রের হাতে সুরক্ষিত কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার সৃষ্টি করে। এই কারণে গান্ধীজি ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের বিরোধিতা করেছেন। এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি ভবিষ্যতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। এই রামরাজ্য ও গান্ধী লোকায়ত সার্বভৌমিকতাকে সমর্থন করেছেন। সমাজজীবন থেকে হিংসার অবসান, জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করা ও রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির স্বার্থে গান্ধীজি লোকায়ত সার্বভৌমিকতার কথা বলেছেন। জনসাধারণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকলে রাষ্ট্র সমাজের অন্যান্য সংগঠনের মত সাধারণ পর্যায়ে নেমে আসবে। এইভাবে মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণা বহুলাংশে নৈরাজ্যবাদী ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর অভিমত অনুসারে আগামী দিনের রাষ্ট্রহীন সমাজে আর্থনীতিক ক্ষেত্রেও বিকেন্দ্রীকরণ সম্পূর্ণ হবে। আগেকার দিনের সরল উৎপাদন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। শিল্প ও উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন কায়েম হবে। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং অর্থনীতি ও সম্পদের সকল ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ সুনিশ্চিত হলে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং এই রামরাজ্যে এখনকার রাষ্ট্রের মত কোন সংগঠন আর থাকবে না। গান্ধীজির পরিকল্পিত ভবিষ্যতের সমাজব্যবস্থা পরিচালিত হবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে। স্বশাসিত ও স্বনির্ভর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিটি শহর ও গ্রামে প্রবর্তিত হবে। এইভাবে ভবিষ্যতের সমাজ হবে সংঘমূলক। এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় আর্থনীতিক, সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ সুনিশ্চিত হবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী গান্ধীজির নৈরাজ্যবাদী ধারণা

মূল্যায়ন (Evaluation)

মহাত্মা গান্ধীকে সঠিক অর্থে নৈরাজ্যবাদী বলা যায় কিনা, সে বিতর্কের অবকাশ আছে। গান্ধী-দর্শনের ব্যাখ্যাকারকদের মধ্যে অনেকে গান্ধীজিকে নৈরাজ্যবাদী বলার পক্ষপাতী। আবার অনেকে তাঁকে নৈরাজ্যবাদী বলার বিরোধী। মহাত্মা গান্ধীকে যে সমস্ত চিন্তাবিদ্ নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক হিসাবে গণ্য করার পক্ষপাতী তাঁদের মধ্যে ড. বিনয় সরকার, ড. গোপীনাথ ধাওয়ান প্রমুখ পণ্ডিতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) ড. সরকার গান্ধীজিকে আলেকজাণ্ডার ক্রপোটকিন, মাইকেল বাকুনিন ও লিও টলস্টয়ের মত নৈরাজ্যবাদী চিন্তাবিদ্ হিসাবে অভিহিত করেছেন। টলস্টয়ের মত গান্ধীজি অহিংসার নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং হিংসার প্রতীক হিসাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে রাষ্ট্রবিমুখতার কথা এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষার কথা আছে। সুতরাং গান্ধীজিকে নৈরাজ্যবাদী বলতে বাধা নেই। (২) ড. ধাওয়ানও মহাত্মা গান্ধীকে নৈরাজ্যবাদী চিন্তাবিদ্ হিসাবে পরিচিত করার পক্ষপাতী। গান্ধীজি সকলের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের কথা বলেছেন। তাঁর মতানুসারে এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন রাষ্ট্রের মাধ্যমে সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্র হিংসাশ্রয়ী। কেবলমাত্র রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রে সকলের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন সম্ভব। রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রে স্বশাসিত গ্রাম-সমাজের সৃষ্টি হয়। এই সমাজের মধ্যে স্বাধীন জনসম্প্রদায়ের মাধ্যমে এই কল্যাণ সাধন সম্ভব। কারণ এ ধরনের রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থায় বলপ্রয়োগ, শোষণ ও স্বার্থপরতার পরিবর্তে অহিংসা, সেবা ও ত্যাগের আদর্শের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এ দিক থেকে বিচার-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজিকে 'দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী' বলা যায়। অনেকে আবার মহাত্মা গান্ধীকে 'ধর্মীয় নৈরাজ্যবাদী' বা 'শান্তিবাদী নৈরাজ্যবাদী' হিসাবে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

অনেকের মতে গান্ধীজি নৈরাজ্যবাদী

গান্ধী-দর্শনের ব্যাখ্যাকারকদের মধ্যে কেউ কেউ মহাত্মা গান্ধীকে নৈরাজ্যবাদী বলার বিরোধী। এই শ্রেণীর চিন্তাবিদ্দের মধ্যে ড. পাওয়ার, ড. মজুমদার, স্প্রীট্, হরিদাস মজুমদার প্রমুখ পণ্ডিতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) পশ্চিমী নৈরাজ্যবাদী চিন্তাবিদ্গণ রাষ্ট্রক্ষমতাকে ধ্বংস করার কথা বলেছেন। মহাত্মা গান্ধীও বিদ্যমান রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু পশ্চিমী পণ্ডিতরা যে অর্থে ও যে কারণে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অবসানের কথা বলেছেন, গান্ধীজি সে অর্থে ও সে কারণে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি।

(খ) ফিলিপ স্প্র্যাট মহাত্মা গান্ধীর উপর লিও টলস্টয়ের কার্যকর প্রভাবের বিষয়টিকে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তিনি গান্ধীজিকে নৈরাজ্যবাদী বলার বিরোধী। হরিদাস মজুমদারের মতানুসারে মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রহিত। গান্ধীজির মতানুসারে সেই রাষ্ট্রই সর্বশ্রেষ্ঠ যে কম শাসন করে। কোন নৈরাজ্যবাদী এ কথা বলতে পারেন না।

(গ) নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার কথা বলেন। মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রকে অন্যায়-অবিচার ও হিংসার প্রতীক হিসাবে দেখেছেন। তাই তিনি রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধনের কথা বলেন নি। রাষ্ট্র অহিংস পথে সমাজে সকলের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করতে পারলে এবং সকলের জন্য ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করতে পারলে গান্ধীজির রাষ্ট্র-বিমুখতা অপসৃত হতে অসুবিধা থাকে না।

(ঘ) ড. পাওয়ার (Paul F. Power)-এর অভিমত অনুযায়ী রাষ্ট্র সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সামগ্রিক বিচারে নৈতিক। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাণ্ডারী ছিলেন। বাস্তব জগতের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাষ্ট্রহীন সমাজের কথা বলেন নি। কারণ সেক্ষেত্রে তাঁর সমকালীন স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্থহীন প্রতিপন্ন হত। এ বিষয়ে টলস্টয়ের সঙ্গে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অনস্বীকার্য।

(ঙ) মহাত্মা গান্ধীকে সামগ্রিক বিচারে নৈরাজ্যবাদী বলা যায় না। তাঁর রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রের ধারণাকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার-বিবেচনা করা দরকার। তিনি রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধিকে সঙ্কুচিত করার পক্ষপাতী। তাঁর মতানুসারে রাষ্ট্র ন্যূনতম শাসন করলেই মঙ্গল। তিনি রাষ্ট্রকে সমাজের সকলের কল্যাণসাধনে নিবেদিত একটি রাজনীতিক সংগঠন হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতানুসারে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্র যত কম নাক গলায় ততই মঙ্গল। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রের সার্থক ভূমিকার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন নি। সমাজের সকলের জন্য রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজকে তিনি স্বাগত জানানোর পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কোন কারণেই ব্যক্তিস্বাধীনতায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে তিনি সমর্থন করেন নি।

(চ) ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতানুসারে মহাত্মা গান্ধী কখনই রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনের কথা বলেন নি। তিনি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে স্বীকার বা সমর্থন করেন নি। সমকালীন রাষ্ট্রনীতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার তিনি বিরোধিতা করেছেন। কারণ তাঁর মতানুসারে এই ব্যবস্থা ছিল অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ। এই কারণে তাঁকে নৈরাজ্যবাদী বলা যায় না।

মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রচিন্তার আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে অসামঞ্জস্য বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। *হিন্দ স্বরাজ* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি একথা স্বীকার করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী তিনি সব সময় বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা-ভাবনা করতেন। এই কারণে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে অনেক সময় অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। এ কথাও তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে সঙ্গতি সংরক্ষণের ব্যাপারেও তিনি তেমন কোন সতর্কতা অবলম্বন করেন নি। অধ্যাপক ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতানুসারে ঐতিহাসিক কার্যকারণ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে দ্বিবিধ সত্তার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। গান্ধীজির মধ্যে আদর্শবাদী দার্শনিকের সত্তা যেমন ছিল, তেমনি ছিল বাস্তববাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সত্তা। বাস্তববাদী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্ হিসাবে তিনি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আন্দোলনের সামিল হয়েছেন। আবার আদর্শবাদী দার্শনিক হিসাবে মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে দার্শনিক নৈরাজ্যবাদ বা ধর্মীয় নৈরাজ্যবাদ বা শান্তিবাদী নৈরাজ্যবাদের অভিব্যক্তি ঘটেছে।

উপসংহার

৭.৩.ঝ. সর্বোদয় সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণা (Gandhiji's Concept of Sarvodaya)

সর্বোদয় দর্শন হল মহাত্মার জীবন-বেদে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে গান্ধীজির উপর রাস্কিনের *Unto this last* গ্রন্থটির প্রভাব সুস্পষ্ট। গান্ধীজি নিজে স্বীকার করে বলেছেন ঃ "That book marked a turning point in my life." তিনি 'আত্মকথা'য় আরও বলেছেন যে, "যে সমস্ত গভীর বিশ্বাস আমার হৃদয়ের মধ্যে নিহিত ছিল, এই বইটিতে আমি তাহারই কতকগুলির প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়াছিলাম।" গান্ধীজি এই বইটির গুজরাটি সংস্করণের নামকরণ করেন 'সর্বোদয়'। ১৯০৪ সালে তাঁর 'আত্মকথায়' গান্ধীজি সর্বোদয়ের তিনটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন ঃ (১) সমষ্টির কল্যাণের মধ্যেই ব্যক্তিকল্যাণ নিহিত, (২) জীবিকা অর্জনের অধিকার সকলের সমান, তাই উকিল ও নাপিতের কাজের মূল্য অভিন্ন, (৩) শ্রমভিত্তিক জীবনই হল সার্থক জীবন, কারণ শ্রমের গুরুত্বই সর্বাধিক। রাজনীতিক চিন্তাজগতে মহাত্মা গান্ধী কিছু অবিস্মরণীয় ও অভিনব অবদান রেখেছেন। এ রকম একটি বিষয় হল গান্ধীজির সর্বোদয়তত্ত্ব। মানবসভ্যতার ইতিহাসে গান্ধীজির সর্বোদয় তত্ত্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, মানবজাতির জন্য ভবিষ্যতের সুখী সমাজ সর্বোদয় পদ্ধতিতেই গড়ে তোলা যায়। অধ্যাপক জোহারী (J. C. Johari) তাঁর *Principles of Modern Political science* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন ঃ "Sarvodaya literally meaning 'the uplife of all' is the most approprite name of Gandhian socialism. It is a principle of a new philosophical, social, ethical, economic and political order whose aim, in the words of Gandhiji's spiritual disciple, Vinoba Bhave, is 'that all may be happy'."

সর্বোদয় ধারণার উৎস

'সর্বোদয়' কথাটি 'সর্ব' এবং 'উদয়'—এই দুটি শব্দের সমাহারে সৃষ্ট। 'সর্বোদয়' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল সকলের কল্যাণ। সর্বোদয়ের মধ্যে সকলের কল্যাণের ধারণা বিধৃত আছে—কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর কল্যাণ নয়। সর্বোদয় সমাজ হল শ্রেণীহীন সমাজ। সকলেই এখানে সমান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অভাজন প্রভৃতি কোন কারণে কারও সঙ্গে এখানে কোন রকম পার্থক্য করা হয় না। সর্বোদয় সকল ধর্মকেই সমান শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সর্বব্যাপী প্রেম-প্রীতি ভালোবাসাই হল এ রকম সমাজের ভিত্তি। এখানে সবল দুর্বলকে রক্ষা করে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের মঙ্গল করে এবং সকলেই সমাজের সদস্য হিসাবে গণ্য হয়। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অবদমিত করা বা শোষণ-পীড়নের ঘটনা এখানে ঘটে না।

সর্বোদয়ের অর্থ

সর্বোদয় সমাজে সকলের কল্যাণ সাধনে সকলে নিযুক্ত থাকবে। ব্যক্তির কল্যাণ সমষ্টির কল্যাণের মধ্যেই নিহিত আছে। সমষ্টিগতভাবে সকল মানুষ ঐক্য ও সংহতি সূত্রে আবদ্ধ থাকবে। অহিংস বা সুখ-শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার আদর্শমূলক আলোচনা সর্বোদয় তত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর হিতবাদী দর্শনে 'সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের' কথা বলা হয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সর্বোদয় তত্ত্বে একের পরিবর্তে অপরের কল্যাণ নয়, বলা হয়েছে সকলের কল্যাণের কথা। এই সকলের কল্যাণই হল ভবিষ্যতের যথার্থ সুখী সমাজের পূর্বশর্ত। মহাত্মার মতানুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। উপযোগিতাবাদীদের মত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণের উপর জোর দিলে সংখ্যালঘুর স্বার্থ বিপন্ন হবে। অনেকের মতে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের সকলের কল্যাণের ভিত্তিতে গান্ধীজির 'সর্বোদয়' ধারণা গড়ে উঠেছে। সম্পূর্ণানন্দ (Sampuranand) তাঁর ***Indian Socialism*** শীর্ষক রচনায় বলেছেন ঃ "It (Sarvodaya) is the name chosen by Mahatmaji for what he considered to be the goal of all effort in the field of public work. It means the Udaya (upliftment) of all, udaya standing not only for material prosperity but for spiritual good."

সর্বোদয় আত্মত্যাগে বিশ্বাসী। পরার্থে আত্মত্যাগ সর্বোদয়ের মূল আদর্শ। আত্মসুখের পরিবর্তে অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানই হবে এখানে প্রত্যেকের আদর্শ, প্রত্যেকের লক্ষ্য হবে অপরের স্বার্থে কিছু দান করা, গ্রহণ করা নয়। এ রকম সমাজে কোনরূপ দ্বন্দ্ব বা বিদ্বেষ থাকবে না। সর্বোদয় সমাজে

আত্মত্যাগ

আত্মত্যাগের আদর্শ এবং নেওয়ার পরিবর্তে দেওয়ার মনোভাব মানুষের মধ্যে থাকতে হবে। নিজের সুখ-স্বার্থ নয়, অন্য সকলের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গের মনোভাব থাকতে হবে। অধ্যাপক বিশ্বনাথ প্রসাদ ভার্মা (V. P. Varma) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ ...the significance of Sarvodaya lies in stressing the permanent value of self-abrogation."

সর্বোদয় সমাজে উৎপাদনের জন্য প্রত্যেকেই পরিশ্রম করবে। প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুসারে সমাজের জন্য কাজ করবে এবং প্রয়োজন অনুসারে পাওনা পাবে। প্রত্যেকে উন্নতির সমান সুযোগ পাবে। এখানে কোন রকম আর্থিক বৈষম্য স্বীকার করা হবে না। সর্বোদয় কৃষি-শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার পক্ষপাতী। কৃষি ও শিল্প হবে পরস্পরের পরিপূরক। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও মার্কসীয় সমাজবাদে রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পত্তির জাতীয়করণের কথা বলা হয়। গণতান্ত্রিক সমাজবাদে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে সম্পত্তির

অর্থনৈতিক আদর্শ

জাতীয়করণের কথা বলা হয় ; কিন্তু মার্কসীয় সমাজবাদে ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বলপূর্বক সম্পত্তি জাতীয়করণের কথা বলা হয়। কিন্তু সর্বোদয় তত্ত্বে সম্পত্তির জাতীয়করণের ধারণাকে স্বীকার বা সমর্থন করা হয় নি। পরিবর্তে গান্ধীজি সম্পত্তির অছিব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অধ্যাপক জোহারী (J. C. Jorhari) তাঁর Principles of Modern Political Science শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ "Sarvodaya pleads for villagisation, decentralisation and gifts as those of labour *(Shramdan)*, of land *(Bhoodan)*, of wealth *(sampathidan)*, and of big shares in village property *(Gramdan)*."

সর্বোদয় সমাজে এইভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্তি ঘটে এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। সর্বোদয়ের লক্ষ্য হল এক উন্নত নৈতিক পরিবেশ দেশের মধ্যে গড়ে তোলা। গান্ধীজির মতানুসারে সত্য, অহিংসা ও সৎ উপায়ের মাধ্যমে এইরকম নৈতিক পরিবেশ

নৈতিক পরিবেশ

গড়ে তোলা সম্ভব হবে। গান্ধীজি মৌলিক নীতি ও আদর্শ হিসাবে সত্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "For me Truth is the sovereign principle, which includes numerous other principles." তেমনি অহিংসার নীতিও মহাত্মার কাছে প্রাণশক্তিস্বরূপ। তিনি বলেছেন ঃ "For me, non-violence is not a mere philosophical principle. It is the rule and breath of my life." এই সমাজ প্রীতি-ভালোবাসা, সহানুভূতি-সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। ব্যক্তি-জীবনের

লক্ষ্য হবে অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও মহান চিন্তা। এ বিষয়ে অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভার্মার অভিমত হল : "Sarvodaya is giving an expression to moral principle of cardinal importance, because it wants to enshrine the primacy of goodness and character in place of the skill of manipulation and self-assertion."

সর্বোদয় গ্রাম ও গ্রামীণ সভ্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই তত্ত্বে সনাতন গ্রামীণ সভ্যতা-সংস্কৃতি পরিপোষণের কথা বলা হয়। গান্ধীজি অনগ্রসর ও অবহেলিত গ্রামগুলির উন্নয়ন সর্বোদয়ের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতানুসারে সর্বোদয় গণতন্ত্রে অগণিত গ্রামকে কেন্দ্র করে ক্রমশ বৃহত্তর গণ্ডীর সৃষ্টি হবে। গ্রামই হল ভারতীয় সমাজজীবনের প্রাণকেন্দ্র। এই কারণে সর্বোদয়ের আদর্শ হিসাবে গ্রামীণ জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা বলেছেন। গান্ধীজি 'সর্বোদয়'-এর ধারণাকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য বিনোবা ভাবে বলেছেন যে প্রথমে গ্রাম-রাজ (Government by village) প্রতিষ্ঠিত হবে। তারপর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। গ্রাম-রাজের স্তরে রাষ্ট্র থাকে, কিন্তু তার প্রকৃতি বদলায়। তারপর শাসনহীন কর্তৃত্বহীন রামরাজ্য গড়ে ওঠে। একেই বলা হয় সর্বোদয় সমাজ, অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য বা বৈকুণ্ঠ। অধ্যাপক জোহারী এ বিষয়ে বলেছেন : "It (Sarvodaya desires the establishment of small village communities in the form of self-sufficing autonomous republics under the administration of panchayats." সর্বোদয় সমাজ হবে গ্রামভিত্তিক। সর্বোদয় তত্ত্বে শহর-জীবনের পরিবর্তে গ্রাম-জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গ্রাম-ভিত্তিক সর্বোদয় সমাজ হবে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও সহানুভূতির রাজত্ব। এ রকম সর্বোদয় সমাজে সকলে সহজ-সরল জীবন যাপন করবে, কিন্তু উচ্চস্তরের চিন্তা করবে। ভি. এন. ট্যানডন (V. N. Tandon) তাঁর *The Social and Political Philosophy of Sarvodaya after Gandhi* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "(Sarvodaya) seeks to build up a society with a bias towards rural civilisation, in which Industries would be decentralised and villages would be as self-sufficient as possible. The desire for a high but simple life would replace the present craze for multiplicity of goods, cooperation would take the place of competition and community spirit would animate society."

গ্রামীণ জীবন

সর্বোদয় আধুনিক সভ্যতা ও শিল্পোন্নয়নকে সমর্থন করে না। এই তত্ত্ব অনুসারে বলা হয় যে, আধুনিক যন্ত্রচালিত সভ্যতা ও শিল্পনীতি ব্যক্তিসত্তা ও সুকুমার বৃত্তিসমূহকে ধ্বংস করে। ভূমি-সংস্কার ও ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমিবণ্টন সর্বোদয়ের অন্যতম নীতি হিসাবে গণ্য হয়। অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভার্মা বলেছেন : "If the *bhoodan* and *gramdan* are technics of Egrarian revolution based on moral force, *sampathidan* is a significant path in the transformation of capitalism into the sarvodaya society."

আধুনিক শিল্প-সভ্যতার বিরোধী

সর্বোদয় দর্শন অনেকাংশে নৈরাজ্যবাদী। এই তত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ ও শোষণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। সর্বোদয়ের লক্ষ্য হল রাষ্ট্রক্ষমতাকে ন্যূনতম ও সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা। গ্রামভিত্তিক ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে 'গ্রামস্বরাজ' বলা হয়ে থাকে। শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং আচার্য বিনোবা ভাবে প্রমুখ সর্বোদয় নেতা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রতত্ত্বের সমালোচনা করেছেন।

গ্রামস্বরাজ

সর্বোদয় ধারণায় রাজনৈতিক দলহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের কথা বলা হয়। সর্বোদয় তত্ত্ব অনুসারে দলীয় ব্যবস্থা জনগণকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে এবং এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। রাজনৈতিক দল জনগণকে ক্ষমতালোভী করে তোলে। ক্ষমতার মাত্রাতিরিক্ত লোভ হিংসার তাণ্ডবের জন্ম দেয়। দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বার্থান্ধ রাজনীতিবিদ্‌দের দাপট পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর সংকীর্ণমনা রাজনীতিবিদ্‌রা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে এবং সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে অনৈক্য ও বৈষম্যের সৃষ্টি করে। দলীয় রাজনীতিক ব্যবস্থায় লাগামছাড়া দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। এই কারণে সর্বোদয় তত্ত্বে রাজনীতিক দলব্যবস্থার বিরোধিতা করা হয়েছে। অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভার্মা এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন : "It (Sarvodaya) wants to replace party strifes, jealousies and competition by sacred law of cooperative mutuality and dominant altruism."

দলব্যবস্থার বিরোধী

সর্বোদয় সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়, সকলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বোদয় প্রত্যক্ষ বা অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্র এবং বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। সর্বোদয় সমাজই হল রামরাজ্য। এখানে

কতিপয় মানুষের পরিবর্তে সকলের শাসন কায়েম হয়। স্বভাবতই সর্বোদয় সমাজে রাষ্ট্র গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় প্রতিপন্ন হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই ধরনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সর্বোদয় সমাজের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নির্বাচিত হবে সর্বসাধারণের দ্বারা। এক্ষেত্রে কোন দলগত ভিত্তি থাকবে না। সর্বোদয় দর্শন পাশ্চাত্ত্য গণতান্ত্রিক দলীয় শাসনব্যবস্থার বিরোধী।

সকলের শাসন

গান্ধীজি সর্বোদয় সমাজের স্বার্থে 'লোক-শক্তি' জাগ্রত করার কথা বলেছেন। লোক-শক্তিই হল সমাজ প্রগতির মূল ভিত্তি। গান্ধীজির মতানুসারে প্রেম-প্রীতি-আত্মত্যাগ এবং সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা ও অহিংসার মাধ্যমে লোক-শক্তিকে জাগ্রত করা সম্ভব।

লোকশক্তি

সর্বোদয় আন্দোলনের মাধ্যমে এক নতুন ধরনের রাজনীতি প্রচলিত করার কথা বলা হয়েছে। এই নতুন ধরনের রাজনীতিকে বলা হয়েছে 'লোকনীতি'। এই লোকনীতির মূল কথা হল আত্মত্যাগ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সুশৃঙ্খল আচরণ, নৈতিক স্বাধীনতা, ঈশ্বর বিশ্বাস, স্বার্থশূন্য জনসেবা, নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব পালন প্রভৃতি। এই লোকনীতির সঙ্গে পশ্চিমী রাজনীতির মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। পশ্চিমী প্রকৃতির রাজনীতিতে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বলপ্রয়োগ, প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, স্বার্থসর্বস্ব রাজনীতিক দল ও গোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়।

লোকনীতি

সর্বোদয় সমাজ সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সমাজে মানুষের চরিত্র হবে উন্নত। তার ফলে অনৈতিক কার্যকলাপ থাকবে না। এই সমাজে উচ্চ-নীচ, অভিজাত-অভাজন ধনী-দরিদ্র প্রভৃতি পার্থক্য থাকবে না। সামাজিক পার্থক্য থাকবে না বলে শ্রেণীগত বিদ্বেষও থাকবে না। একে অপরকে শোষণ করবে না। সংখ্যাগুরুর দ্বারা সংখ্যালঘুর শোষণের ঘটনা ঘটবে না। সকলের সততা ও ন্যায়-নীতিবোধ হবে উন্নত। স্বাধীন বিচারবোধের দ্বারা সকলে পরিচালিত হবে। স্বভাবতই সর্বোদয়-সমাজে সকলে অধিকতর স্বাধীনতার অধিকারী হবে।

অধিকতর স্বাধীনতা

সমালোচনা (Criticism) ঃ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীজির সর্বোদয় দর্শনের বিরূপ সমালোচনা করা হয়।

(১) সমালোচকদের মতানুসারে সর্বোদয় তত্ত্ব হল একটি অবাস্তব কাল্পনিক আদর্শ। প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থপর এবং অন্যান্য বহুবিধ ত্রুটিযুক্ত মানুষকে নিয়ে সর্বোদয় সমাজের প্রতিষ্ঠা বাস্তবে অলীক প্রতিপন্ন হয়। মহাত্মা মানব প্রকৃতির বাস্তব রূপটিকে বিবেচনা করেন নি। সর্বোদয় একটি মহান আদর্শ। কিন্তু বাস্তব জগতে এই নীতি ও আদর্শ অনুসারে কোন সমাজব্যবস্থার সংগঠন কার্যতঃ অসম্ভব। সর্বোদয় সমাজের সৃষ্টি ও সাফল্য মানুষের প্রকৃতি-প্রবৃত্তি ও কার্যকলাপের উপর নির্ভরশীল। সর্বোদয় সমাজের সাফল্যের জন্য মানুষের মধ্যে আত্মত্যাগের মানসিকতা থাকা দরকার। কিন্তু বাস্তবে সর্বোদয়ের এই পূর্বশর্তটি অতিমাত্রায় অনিশ্চিত। এ বিষয়ে গান্ধীজির মনেও সংশয় সন্দেহ ছিল।

অবাস্তব

(২) সর্বোদয় দর্শনের দলহীন গণতন্ত্রের (Partyless democracy) ধারণাও অলীক কল্পনামাত্র। বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে অপরিহার্য মনে করা হয়। তাছাড়া শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীস্বার্থের ধারক ও বাহক হিসাবে একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। দলহীন পরিচালন ব্যবস্থা গ্রামীণ সমাজের সীমিত পরিধির মধ্যে সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তা অসম্ভব। এই কারণে বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে দলীয় শাসনব্যবস্থাকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

দলহীন গণতন্ত্র অসম্ভব

(৩) সর্বোদয় সমাজ সংখ্যাগরিষ্ঠের নয়, সকলেরই শাসন প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। কিন্তু সমালোচকদের মতানুসারে এই পরিকল্পনা অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। বাস্তবে কোন বিষয়ে সকলে সমমত পোষণ করতে পারে না। আর রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে একমত প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অবাস্তব ব্যাপার। তা ছাড়া বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকেই বোঝানো হয়। সর্বোপরি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে সরকারী সিদ্ধান্ত সব সময় সংখ্যালঘুর স্বার্থবিরোধী হবে—এ রকম যুক্তি অর্থহীন।

সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের সমালোচনা অযৌক্তিক

(৪) গান্ধীজি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন। কিন্তু সমালোচকদের মতানুসারে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সমাজে সকল প্রকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, তাছাড়া ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতা এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে। আবার ভৌগোলিক ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তিতে সকল সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ত্রুটি

(৫) সমালোচকদের মতে সর্বোদয় সভ্যতা পশ্চাৎগতির লক্ষণ। এখানে সনাতন জীবনধারা এবং প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার কথা বলা হয়। আধুনিক নগর সভ্যতা, শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি প্রভৃতি বিংশ শতাব্দীর শিল্প-সভ্যতার কোন কিছুকেই সর্বোদয় তত্ত্বে স্বীকার করা হয় নি।

রক্ষণশীল

(৬) সর্বোদয়ের অন্যতম প্রবক্তা আচার্য বিনোবা ভাবে ভূমিসংস্কার ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের জন্য যে ভূ-দান আন্দোলনের কথা বলেছেন তাও এক অবাস্তব কর্মসূচী। এইভাবে ভূমিসমস্যার সুষ্ঠু ও সঠিক সমাধান যে অসম্ভব তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

ভূ-দান আন্দোলন ব্যর্থ

(৭) গান্ধীজির সর্বোদয় তত্ত্বে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের পরিবর্তে শ্রেণীসমঝোতার কথা বলা হয়। কিন্তু মার্কসবাদীদের মতানুসারে অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক সমাজে শ্রেণীসংঘাতের ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। এ হল এক ঐতিহাসিক সত্য। গান্ধীজি এই ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা করেছেন। এই কারণে মতবাদটি অনৈতিহাসিক।

অনৈতিহাসিক

(৮) মার্কসবাদিগণ গান্ধীজির সত্য ও অহিংসার নীতিকে সমর্থন করেন না। তাঁদের মতানুসারে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী-স্বার্থ থাকলে সত্য ও অহিংসা থাকতে পারে না। তাই মার্কসবাদীরা প্রয়োজনে সহিংস বিপ্লবের কথা বলেন।

সত্য ও অহিংসার আলোচনা

(৯) মহাত্মা গান্ধী শাসনমুক্ত সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলের অংশগ্রহণের কথা বলেছেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। কিন্তু জনসাধারণের সকলে শাসনকার্যে যোগ দেবে এ ধারণা অচল। এখনকার বৃহদায়তনবিশিষ্ট ও জনবহুল সমাজব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অসম্ভব এবং অনেকের মতে অকাম্য।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অসম্ভব

(১০) অধ্যাপক জোহারীর অভিমত অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধীর সর্বোদয় তত্ত্ব বিভিন্ন রাষ্ট্রনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। মার্কসবাদীদের মতানুসারে সর্বোদয় তত্ত্ব ওয়েন ও সাইমনের মতবাদের সমগোত্রীয়। সর্বোদয় তত্ত্বের সীমাবদ্ধ সরকার ও মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনের ধারণাকে সামগ্রিকতাবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সমর্থন করেন না। তেমনি আবার উদারনীতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সর্বোদয় তত্ত্বকে সন্দেহের চোখে দেখেন। সর্বোদয়ের আদর্শ সমাজ মাটির পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব কিনা সে-বিষয়ে এই শ্রেণীর চিন্তাবিদ্‌দের মনে সংশয় সন্দেহ ছিল। অধ্যাপক জোহারী বলেছেন : "The Marxists would scoff at the whole school of Sarvodaya as one belonging to the world of Owenites and St. Simonians ; the collectivists would not endorse the suggestion of a very limited government in view of a man's life of minimum wants ; and liberals would have every reason to doubt the feasibility of an ideal society as conceived by the Sarvodayists."

অধ্যাপক জোহারীর অভিমত

(১১) মহাত্মা গান্ধীর সর্বোদয় তত্ত্বে মানুষের বিভিন্ন চাহিদা ও দাবি-দাওয়াকে সীমাবদ্ধ করার আলোচনা আছে। সর্বোদয়ের আদর্শে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন হয়। বস্তুত সর্বোদয় তত্ত্বকে সর্বাংশে রাজনীতিক মতবাদ বলা যায় না বরং এ হল বহুলাংশে একটি সামাজিক ধর্মীয় আদর্শ।

বহু বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও গান্ধীজির সর্বোদয়-দর্শনের আদর্শগত মূল্য অনস্বীকার্য। সর্বোদয় তত্ত্বে এক আদর্শ ও উন্নত সমাজের পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে। সত্য ও অহিংসার সঙ্গে বিশ্ববাসীর প্রতি গান্ধীজির আর একটি মূল্যবান নীতিশিক্ষা হল লক্ষ্য ও পথের অভিন্নতা। তাঁর মতানুসারে উত্তম কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য উপায়টিও উৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। বর্তমানে গান্ধীজির পঞ্চায়েতীরাজ সম্পর্কিত ধারণা বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বর্তমানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু আছে। তা ছাড়া বেকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজির শ্রমনিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। গান্ধীজির সর্বোদয়ের আদর্শের পরিপূর্ণ ও যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সমস্যাসংকুল বিশ্বের বহু জটিল সমস্যার সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে। সর্বোদয় তত্ত্বের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অধ্যাপক জোহারী (J. C. Johari) তাঁর ***Principles of Modern Political Science*** শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "It takes much from the spirit of Western Liberalism an Socialism and integrates it with the best of the spiritualism and humanism of the East. It assimilates all that is good and valuable in others so long as it is consonant with the ethos and sprit of the Indian culture and philosophy."

মূল্যায়ন

৭.৩.ঞ. অছি ব্যবস্থা সম্পর্কিত গান্ধীজির ধারণা (Gandhiji's Concept of Trusteeship)

মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রচিন্তার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তার অছিবাদের ধারণা। গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তায় অছিবাদ বলতে স্বরাজ বা গ্রাম স্বরাজ অর্জনের এক বিশেষ উপায়কে বোঝায়। হিন্দ স্বরাজ বা সর্বোদয় অর্জন করার মূল কথা হল ত্যাগের আদর্শ। মহাত্মা গান্ধীর অছিবাদের ধারণায় এই ত্যাগের আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। গান্ধীজির রাজনীতিক দর্শন ও কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থার মৌলিক সংস্কার সাধনের জন্য মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন সাধন। এবং এই কারণেই গান্ধীজি অছি-ব্যবস্থার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে আগ্রহী হয়েছেন। তাঁর অছিবাদী ধারণার প্রেরণা হল ভারতের সনাতন ধর্ম। এ দেশের সনাতম ধর্ম-দর্শনে স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা অনুপস্থিত।

অছিবাদী ধারণার উৎস

মহাত্মা গান্ধীর অছিবাদী ধ্যান-ধারণার উৎস হিসাবে ঈশোপনিষদের কথা বলা হয়। এই উপনিষদের প্রথম শ্লোকেই অছিবাদী চিন্তা-ভাবনার কথা আছে। ঈশোপনিষদের এই শ্লোকে ত্যাগের মাধ্যমে ভোগের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকে তার অর্জিত যাবতীয় জাগতিক সম্পদ-সামগ্রী পরমেশ্বরে নিবেদন করে সকলের সঙ্গে সমভাবে সমাজের সকলের কল্যাণে ভোগ করবে। তা ছাড়া অপরের প্রাপ্য সম্পদ আত্মসাৎ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ত্যাগের মাধ্যমে ভোগের আদর্শ এবং অপরের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ না করার নীতি গান্ধীজির মধ্যে যুবা বয়সেই দৃঢ়মূল হয়ে যায়।

মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ বাস্তবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তিনি সামাজিক ধন-সম্পদকে ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রাখায় বিরোধিতা করেছেন। সামাজিক ধন-সম্পদকে তিনি অছির অধীনে রাখার সুপারিশ করেছেন।

সম্পদের সামাজিক মালিকানা

সমাজে আয় ও সম্পদের বণ্টনের বৈষম্য দূর করা দরকার। এবং তার জন্য জরুরী হল ধন-সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করা। অছি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব ও সফল হতে পারে। ধন-সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে অছি-ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক মালিকানায় পরিণত করা যায়।

মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে সামাজিক সম্পদসমূহ সকলের ভোগের জন্য। সুতরাং সকলের ভোগের জন্য সমাজের যাবতীয় ধন-সম্পত্তি উন্মুক্ত করে দেওয়া দরকার। সমাজের সকল সম্পদ-সম্পত্তির মালিকানা মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত হলে সমাজব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক ভেদাভেদ, সন্দেহ-শত্রুতা ও শোষণমূলক সম্পর্কের সৃষ্টি হবে। এই ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতাবোধ সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে গ্রাস করবে। অছি ব্যবস্থার মাধ্যমে পুঁজিপতিরা ও ব্যবসায়ীরা অনৈতিক পথে অর্থোপার্জন থেকে বিরত হবে। তারা সৎপথে সহজ-সরল জীবন যাপন করবে। যতটুকু অর্থ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য আবশ্যক ততটুকই তারা অর্জন ও ভোগ করবে। এইভাবে সম্পদ-সম্পত্তির অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভবনের আগ্রহের অবসান ঘটবে। তার ফলে সমাজব্যবস্থার মধ্যে ভেদাভেদ, শোষণ ও বৈষম্য বিলুপ্ত হবে। সম্পদ-সম্পত্তি সংগ্রহের ও পুঞ্জীভবনের উদগ্র উন্মাদনা যদি থাকে তা হলে সমাজের সকলকে ভালবাসা যায় না। সম্পদ সংগ্রহের মাত্রাতিরিক্ত বাসনাকে বিসর্জন দিতে হবে, তবেই সমাজের সকলকে ভালবাসা সম্ভব হবে। এই কারণে গান্ধীজি অছিব্যবস্থা প্রবর্তনে পক্ষপাতী ছিলেন। অছি-ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে ধন-সম্পত্তির পুঞ্জীভবনের প্রবণতাকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে। মানুষের মনকে অছি-ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণমূলক প্রবৃত্তির পথ থেকে নিবৃত্ত করা যাবে। মানব প্রকৃতির মৌলিক সংস্কার সাধন সম্ভব। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল।

অছি-ব্যবস্থার সাহায্যে মানব প্রকৃতির সংস্কার সাধন

মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রদর্শন সমাজতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার অনুগামী নয়। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় মতবাদেরই বিরোধী হল গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তা। আবার মহাত্মার রাষ্ট্রীয় মতাদর্শকে এই দুই বিপরীত মেরুর মতাদর্শের সমাহারও বলা যায় না। ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ এই দুই মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনীতিক চিন্তাজগতে। এবং এই দুই মতবাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সকলে সচেতন। গান্ধীজি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে অপসারিত করার ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হয়েছিলেন। মানবসমাজকে অনিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রের অনৈতিক কুফল থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে গান্ধীজির উদ্যোগ-আয়োজন ও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি অছিবাদী মতাদর্শের কথা বলেছেন। অছিব্যবস্থা হল ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বাইরে এক তৃতীয় রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থা।

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী

অছি-ব্যবস্থা অনুসারে বলা হয় যে, সম্পদ-সম্পত্তি ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। তবে সম্পত্তির মালিক-ব্যক্তি নিজেকে সম্পত্তির রক্ষক হিসাবে বিবেচনা করবে, মালিক হিসাবে মনে করবে না। এ হল

ঈশোপনিষদের অপরিগ্রহের আদর্শ। অপরিগ্রহের আদর্শের উপর অছিবাদ প্রতিষ্ঠিত। মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের অন্যতম অঙ্গ হল অপরিগ্রহ। গান্ধীজি অপরিগ্রহ ও সমভাব এই দুটি আদর্শের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতানুসারে অপরিগ্রহ ও সমভাবের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা নিহিত আছে। গান্ধীজির এই ধারণার উৎস হল গীতা। মহাত্মা গান্ধী তাঁর *The Story of my Experiments with Truth* শীর্ষক রচনায় বলেছেন : "I understand the Gita-teaching of non-possession to mean that those who desired salvations should act like a trustee who, though having control over great possessions, regards not an iota of them as his own." এই ধারণা অনুসারে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যতটুকু প্রয়োজন, কেবলমাত্র ততটুকুর উপরই আমাদের অধিকার আছে। তার অতিরিক্ত আশা করা ও সংগ্রহ করা চৌর্যবৃত্তির সামিল এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

অছি-ব্যবস্থার ধারণা

অছি-ব্যবস্থার কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে অবহিত হওয়া আবশ্যক। (ক) অছি ব্যবস্থায় সমাজের কল্যাণে ব্যবহৃত ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে স্বীকার করা হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবহার অছি-ব্যবস্থায় অস্বীকৃত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্দেশ্য হবে ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ। (খ) অছি-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল সম্পত্তি-সম্পদকে সমাজের যৌথ মালিকানায় নিয়ে আসা এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করা। বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান এবং সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করাই হল লক্ষ্য। অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় পরিণত করাই হল অছিবাদের মূল লক্ষ্য। (গ) অছি ব্যবস্থায় মুনাফার পরিবর্তে সমাজের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। (ঘ) সকলের ন্যায়সঙ্গত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয় অছি-ব্যবস্থায় নির্ধারিত হবে। (ঙ) অছি-ব্যবস্থায় আইন থাকতে পারে, কিন্তু আইনের প্রাধান্য থাকবে না। (চ) সমাজের স্বার্থে রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে অছি-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

অছি-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অছি-ব্যবস্থার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষভাবে প্রতিপন্ন। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক।

(১) ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয় ও পুঞ্জিভূত ধন-সম্পত্তির ক্ষেত্রেই অছি-ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা প্রতিপন্ন হয়।

(২) অছিবাদ অনুযায়ী অতিরিক্ত সম্পদ-সম্পত্তি অছি-ব্যবস্থার আওয়ায় থাকবে ও পরিচালিত হবে।

(৪) মহাত্মা গান্ধী আধুনিককালের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন নি। সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনকে তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী সমাজের চূড়ান্ত অনুমোদনের মাধ্যমে অছি বা উত্তরাধিকার নির্ধারিত হবে।

(৫) অছিবাদে সম্পত্তির জাতীয়করণ বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনকে স্বীকার বা সমর্থন করা হয় নি। অছিবাদে সম্পত্তির মালিকের মানসিকতা ও প্রকৃতির পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। সম্পত্তি যাদের আছে, তারা নিজেদের সম্পত্তির সর্বময় কর্তা বা মালিক হিসাবে মনে করবে না। নিজেদের তারা সম্পত্তির ট্রাস্টী, অর্থাৎ অভিভাবক বা রক্ষাকর্তা হিসাবে মনে করবে। সম্পত্তি হল সামাজিক সম্পত্তি। সমাজের সকলের কল্যাণে সম্পত্তি ব্যবহৃত হবে।

(৬) অছিবাদে অধিকারের সমতার কথা বলা হয়েছে। পারিতোষিকের সমতার কথা বলা হয় নি। অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অধিকতর পরিমাণে সম্পত্তি রাখতে পারবে। মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তি-মানুষের অধিকতর গুণগত যোগ্যতাকে অবদমিত করতে চান নি। বরং সমাজের সকলের কল্যাণে তিনি ব্যক্তি-মানুষের যোগ্যতার বা ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন।

(৭) অছিবাদ অনুযায়ী অছি-ব্যবস্থার অধীন সম্পত্তির অপব্যবহার রোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

মহাত্মা গান্ধী বিশেষ এক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অছিবাদী ধ্যান-ধারণার অবতারণা করেছেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের সম্ভাব্য মৌলিক অধিকারের ধারণা থেকেই অছি-ব্যবস্থা ও সম্পত্তি সম্পর্কিত গান্ধীজির ধ্যান-ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। ১৯৩১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে গান্ধীজি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে কতকগুলি বিশেষ মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়। বলা হয় যে ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষ এই সমস্ত মৌলিক অধিকার ভোগ করবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর পরিকল্পিত গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার কতকগুলি অপরিহার্য অধিকারের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এই অধিকারগুলি হল : (ক) প্রত্যেক মানুষের সুষম খাদ্যের অধিকার থাকবে ; (খ) সুন্দর আবাসনের অধিকার থাকবে, (গ) সন্তান-সন্ততিদের

অছিবাদী আদর্শের পরিপ্রেক্ষিত

শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার অধিকার থাকবে এবং (ঘ) প্রয়োজনীয় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা প্রত্যেকের জন্য থাকবে। গান্ধীজির মতানুসারে প্রভূত ধন-সম্পত্তি অর্জন ও অধিকার অপ্রয়োজনীয়। যাদের এই অতিরিক্ত সম্পত্তি আছে তারা জনসাধারণের অছি হিসাবে এই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করবে। জনসাধারণের অভাব-অনটনের নিরসনের জন্য এই অতিরিক্ত সম্পত্তি ব্যয়িত হবে। গান্ধীজির অভিমত অনুযায়ী জগতের সবকিছুই ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত। কোন ব্যক্তির সম্পদ-সম্পত্তি তার প্রাপ্য ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সেই অতিরিক্ত সম্পত্তি অছি হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কারণ কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য নয়, ঈশ্বরের সন্তান সকলের জন্য সেই সম্পদ-সম্পত্তি ব্যবহৃত হবে।

সমালোচনা (Criticism) ঃ মহাত্মা গান্ধীর অছিবাদ বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। বিরুদ্ধবাদীরা অছিবাদী ব্যবস্থার বিভিন্ন বিরূপ সমালোচনা করেছেন। এই সমস্ত সমালোচনা সূত্রে অছিবাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

(১) অছিবাদী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী একজন কাল্পনিক সমাজবাদী হিসাবে প্রতিপন্ন হন। সম্পদ-সম্পত্তির জন্য মানুষের উদগ্র বাসনা কত তীব্র হতে পারে সে বিষয়ে গান্ধীজির সম্যক ধারণা ছিল না। সমালোচকদের মতানুসারে অছিবাদী ধ্যান-ধারণা গান্ধীজিকে সাঁ সিমোঁ, রবার্ট ওয়েন প্রমুখ ইউরোপীয় চিন্তাবিদের পর্যায়ভুক্ত করেছে। গান্ধীজির অছিবাদ অতিমাত্রায় অবাস্তব।

অবাস্তব

(২) অছিবাদী ব্যবস্থা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণের সপক্ষে একটি আদর্শবাদী পরিকল্পনা হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। সমালোচকদের মতানুসারে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে আড়াল করার জন্য অছিবাদী আদর্শের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) সমাজের অধিকাংশ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের জন্য দায়ী হল অসম বণ্টন ব্যবস্থা। অছি-ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে অসম বণ্টন ব্যবস্থার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে এবং প্রকারান্তরে সমর্থনও করা হয়েছে।

(৪) মার্কসবাদীদের মতানুসারে অছি-ব্যবস্থা অবৈজ্ঞানিক। কারণ গান্ধীজি উৎপাদনের উপাদানসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানের কথা বলেন নি। শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের হাতে সম্পদ-সম্পত্তির মালিকানা থাকবে এবং তারা এই সম্পত্তির অছি হিসাবে সকলের স্বার্থে ভূমিকা পালন করবে, এ ধারণা অবৈজ্ঞানিক।

অবৈজ্ঞানিক

(৫) মার্কসবাদীদের আরও অভিমত হল সমাজে শ্রেণী-ব্যবস্থা বা শ্রেণী-বৈষম্য অব্যাহত থাকাকালীন অবস্থায় শ্রেণী-সম্প্রীতি বা শ্রেণী-সমঝোতা সম্ভব নয়। কারণ আর্থনীতিক স্বার্থের বৈষম্যের ভিত্তিতে শ্রেণী-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করেছেন।

(৬) সমালোচকদের মতানুসারে অছিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের মর্যাদাকে অবহেলা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবন-মরণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অন্য কারও দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। এ হল মানুষের মর্যাদার প্রশ্ন। অথচ মহাত্মা গান্ধীর অছি-ব্যবস্থার পরিকল্পনায় সহায়-সম্বলহীনদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পদশালীদের শুভবুদ্ধির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মর্যাদা বিরোধী

(৭) গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা গান্ধীজির অছিবাদী পরিকল্পনাকে সমর্থন করতে পারেন না। কারণ তাঁরা সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করেন। আবার মার্কসবাদী দার্শনিকরাও অছি-ব্যবস্থাকে কাল্পনিক সমাজবাদ হিসাবে সমালোচনা করেন।

(৮) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও গান্ধীজির অছিবাদী ধ্যান-ধারণাকে সমর্থন করতে পারেন নি। তিনিও তাঁর 'আত্মজীবনী' (Autobiography)-তে অছি-ব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনা করেছেন। অছি-ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "Is it reasonable to believe in the theory of trusteeship to give unchecked power and wealth to an individual and to expect him to use it entirely for the public good ? Are the best of us so perfect as to be entrusted in this way ? Even Plato's philosopher kings would hardly have borne this burden worthily. An is it good for other to have even their benevolent superman over them ?"

পণ্ডিত নেহরুর সমালোচনা

৭.৩.ট. ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণা (Gandhiji's Concept of Religion and Politics)

মধ্যযুগের পশ্চিমী রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে রাজনীতির উপর ধর্মের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। এই

সময় পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে রাজনীতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত চার্চ ও যাজক সম্প্রদায়ের দ্বারা। এই সময় জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা সুস্পষ্টভাবে গড়ে উঠতে পারে নি। সমকালীন পশ্চিমী রাজনীতিক ব্যবস্থায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য গির্জা ও যাজক সম্প্রদায় রাজশক্তি ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধির ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করত। স্বভাবতই সমকালীন সমাজজীবনে অব্যবস্থা-অরাজকতা, দুর্নীতি-দুরবস্থা ছিল লাগামছাড়া। রাজনীতির উপর ধর্মের এই বিরূপ প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়। এবং এই কারণে আধুনিককালের রাষ্ট্রচিন্তায় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি সর্বজনস্বীকৃত বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধীর অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। আত্মজীবনীতে তিনি জানিয়েছেন যে, ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা মস্ত ভুল। ধর্মের দ্বারা অনুশাসিত রাজনীতির মধ্যে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। এটাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মহাত্মা মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মকে বিচার করেন নি। গান্ধীজি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম ও রাজনীতির বিষয়টিকে বিচার-বিবেচনা করেছেন।

ধর্ম ও রাজনীতি— মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা ও গান্ধীজি

মহাত্মা গান্ধী ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে বা রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে সংযুক্ত করার ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন। মহাত্মার মতানুসারে রাজনীতি ধর্মহীন হতে পারে না। ধর্মবর্জিত রাজনীতি একটি মৃত্যুফাঁদ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। ধর্মবর্জিত রাজনীতি মানুষের আত্মার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গান্ধীজি বলেছেন ঃ "There are no politics devoid of religion. Politics bereft of religion is a death-trap that kills the soul." গান্ধীজি সত্য ও অহিংসার পূজারী ছিলেন। তিনি রাজনীতিকে ধর্মের শক্তির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত বলে গণ্য করেছেন। মহাত্মার মতানুসারে ধর্মের পবিত্র কর্তব্য বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির মনে স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি প্রেম-প্রীতির অনুভূতি থাকতে পারে না। ধর্ম থেকে রাজনীতিকে যাঁরা বিচ্ছিন্ন করার কথা বলেন, তাঁরা ধর্মের সঠিক অর্থ সম্পর্কে অনবহিত। গান্ধীজি বলেছেন যে, ধর্মকে রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করে তিনি নিজের সঙ্গে এবং বন্ধুদের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তিনি যে ধর্মের কথা বলেছেন, তা হিন্দু ধর্মকে ছাড়িয়ে যায়। *হিন্দুস্বরাজ গ্রন্থে* গান্ধীজি বলেছেন ঃ "I have been experimenting with myself and my friends by introducing religion into politics... It is the religion which transcends Hinduism."

ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কযুক্ত

ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক গভীর সম্পর্কের বিষয়টিকে গান্ধীজি আর একদিক থেকে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী মানুষের কাজকর্মের একটা সামগ্রিকতা বা সামগ্রিক অভিব্যক্তি আছে। সুতরাং মানুষের কার্যকলাপকে ধর্মীয়, রাজনীতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগে সম্পূর্ণভাবে পৃথকীকরণ করা সম্ভব নয়। মানবজীবনের এই সামগ্রিকতা বা কার্যকলাপকে বাদ দিয়ে ধর্ম বা রাজনীতি হতে পারে না। মানুষের কর্মজীবন ধর্মের মাধ্যমে নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম ব্যতিরেকে মানুষের কর্মজীবন অর্থহীন প্রতিপন্ন হয়। মহাত্মার মতানুসারে সমগ্র মানবজাতির অংশীদার হিসাবে ধর্মীয় জীবনযাপন করা যায়। এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে তা করা যায় না। গান্ধীজি বলেছেন যে, জনজীবন সম্পর্কে তাঁর সচেতন হওয়ার সময় থেকেই তাঁর যাবতীয় কথা ও কর্মের পিছনে একটি সুস্পষ্ট ধর্মীয় উদ্দেশ্য ও ধর্মীয় চেতনা বর্তমান। মহাত্মা গান্ধীর নিজের কথায় ঃ "At the back of every word that I have uttered since I have known what public life is, and of every act that I have done, there has been a religious consciousness and downright religious motive."

জনজীবনের সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম ও রাজনীতি

ধর্ম মাহাত্মা গান্ধীকে রাজনীতিক করেছে। গান্ধীজির রাজনীতি হল ধর্মীয়। তিনি রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন করেছেন এবং ধর্মকে উদারনীতিক করেছেন। গান্ধীজি মেকিয়াভেলীর রাজনীতিকে বাদ দিয়ে উদারনীতিক ধর্মকে গ্রহণ ও অবলম্বন করার কথা বলেছেন। ধর্মকে বাদ দিয়ে রাজনীতি হতে পারে না। ধর্মীয় নিয়ম-নীতির দ্বারা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। সমাজজীবন থেকে ধর্মকে উৎখাত করা যায় না। আর যদি তা করা হয়, তা হলে সুস্থ সমাজজীবনের অবসান ঘটবে। গান্ধীজি বলেছেন ঃ "To try to root out religion itself from society is a wild goose chase. And were attempt to succeed, it would mean the destruction of society."

ধর্মকে বাদ দিয়ে রাজনীতি হয় না

ধর্ম সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণা মৌলবাদী সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামি থেকে মুক্ত। মহাত্মার মতানুসারে প্রকৃত ধর্ম বলতে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপকে বোঝায়। ধর্ম মঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস এবং সকল মানুষের জন্য ভালবাসা। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রত্যেকের

মধ্যে দৃঢ় ঈশ্বরবিশ্বাস এবং মানবজাতির জন্য নিখাদ ভালবাসা থাকতে হবে। মহাত্মা গান্ধীর কাছে ধর্ম ও নৈতিকতা সমার্থক প্রতিপন্ন হয়েছে। ধর্ম হল এ জগতের সুশৃঙ্খল নৈতিক শাসনব্যবস্থার উপর বিশ্বাস। ধর্ম বলতে জীবনধারণের বিশেষ এক প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সত্যকে অনুধাবন ও উপলব্ধি করা সম্ভব। সামাজিক ন্যায় ও সমাজবোধের সৃষ্টি হয় ধর্মীয় চেতনা ও সত্য-উপলব্ধির ভিত্তিতে। ধর্ম বলতে গান্ধীজি নির্দিষ্ট কোন ধর্মের কথা বলেন নি। তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাঁর ঈশ্বর হলেন সত্য। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষ ও মানবসমাজকে নীতিবোধের দ্বারা প্রভাবিত করা। কেবলমাত্র সত্যের ভিত্তিতে নীতিনিষ্ঠ মানুষ ও নৈতিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। বিজয়রাঘবন ও জয়ারাম (S. Vijayaraghaban & Dr. S. Jayaram) তাঁদের *Political Thought* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ "....a moral man and moral society could be obtained when truth stood arrayed against all tyranny whether that tyrany was of the state or society or of the individual."

ধর্মের ধারণা

মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে যথার্থ ধর্ম যাবতীয় ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। গান্ধীজি বিশেষ কোন ধর্মীয় মতাদর্শের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর ধর্মবোধ ছিল বিশ্বজনীন। বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের প্রভাবে মানুষ হয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। সত্য ও অহিংসার ধারণা থেকে গান্ধীজি প্রবল আত্মিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। সত্য ও অহিংসার ধারণা এবং এই আত্মিক শক্তি তিনি সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শ থেকে। শৈশব অবস্থায় তিনি প্রভাবিত হয়েছেন বৈষ্ণব ও জৈন ধর্মের দ্বারা। পরবর্তীকালে খ্রীস্ট ধর্মের আদর্শ এবং ইসলাম ধর্মের শান্তির বাণী গান্ধীজিকে আকর্ষণ করেছে। ভাগবৎগীতা, উপনিষদ, মনুস্মৃতি মহাত্মার মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। আবার বৌদ্ধধর্মের অহিংসার আদর্শ ও সন্ত তুলসীদাসের ধ্যান-ধারণা মহাত্মার মনোজগতে দাগ কেটেছে। গান্ধীজি পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমপর্যায়ভুক্ত জ্ঞান করেছেন এবং প্রতিটি ধর্মমতকে সত্য ও ঈশ্বরের সমার্থক বলে প্রতিপন্ন করেছেন। গান্ধীজির মতানুসারে যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন ধর্মমত বা পথের পথিক হতে পারে। কিন্তু কেউ যেন তার ধর্মমতকে অশুভ ইচ্ছা, শত্রুতা বা হিংসার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার না করে। ধর্মের অপব্যাখ্যা সূত্রেই সামাজিক ক্ষেত্রে এবং জনজীবনে বিভেদ-বিদ্বেষ ও অসদ্ভাব-অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় অপব্যাখ্যার অপপ্রভাবের ঊর্ধ্বে থাকা উচিত। মহাত্মা গান্ধী সর্বজনীন ও শাশ্বত নীতিবোধকে উজ্জীবিত করার ব্যাপারে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। এবং এ ক্ষেত্রে তিনি ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। সত্যাগ্রহের আদর্শের অনুগামী গান্ধীজি বিশেষভাবে যুক্তিবাদী ছিলেন। যুক্তির আবেদন অনুযায়ী কাজ না করলে সত্যাগ্রহী হিসাবে কাজ করা যায় না। মহাত্মা গান্ধীর ধর্মের ধারণা তাঁর যুক্তিবোধ ও অভিজ্ঞতাকে আচ্ছন্ন করে নি। জোয়ান ভন বনডুরান্ট (Joan Von Bondurant) তাঁর *Conquest of Violennce* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ "Gandhi's religious predilections did not obscure his reasonableness nor his willingness to accept the results of empirical tests. The element of appeal to reason is essential for the functioning of satyagraha."

বিশ্বজনীন ধর্মবোধ

মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে ধর্মীয় শক্তির সহযোগিতা ব্যতিরেকে অহিংসা ও সত্যাগ্রহের প্রক্রিয়া সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হতে পারে না। সেচ্ছায় স্বধর্ম গ্রহণ এবং উৎসাহ-উদ্যোগের সঙ্গে স্বধর্ম পালনই হল যথার্থ ধর্মীয় মনোভাব। গান্ধীজির কাছে ধর্ম পবিত্র শক্তির সঙ্গে সমার্থক। ভাগবৎ গীতার নীতি-নির্দেশ অনুযায়ী নিঃস্বার্থ সেবামূলক কাজকর্ম সম্পাদনই হল ধর্ম। একেই বলা হয়েছে কর্মযোগ। এই মনোভাব ব্যক্তি-মানুষের আত্মশক্তিকে ক্রমশঃ বিকশিত করে। মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের অনুসন্ধান কেবলমাত্র ধর্মভিত্তিক সমাজেই সফল ও সার্থক হতে পারে।

নিঃস্বার্থ সেবা

মহাত্মা গান্ধীর অভিমত অনুযায়ী ধর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তিতে মানুষের সমগ্র জীবন পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। গান্ধীজির কাছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত ধর্ম ছিল নিতান্তই সহজ-স্বাভাবিক, কিন্তু একেবারে অপরিহার্য। মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র চিন্তা-চেতনা জুড়ে নৈতিকতার পরিপূর্ণ প্রাধান্য ছিল। এবং এর থেকেই গান্ধীজির ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা বিকশিত ও বিবর্তিত হয়েছে। নৈতিকতার মূল্যবোধকে মানবজীবনে সঞ্চারিত করার ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ ও উদ্যোগ-আয়োজনের অভাব ছিল না। এবং এই কারণেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত করেছেন।

ধর্ম ও নৈতিকতা

মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে উদ্দেশ্যগত বিচারে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন রকম স্ববিরোধিতা নেই। মানবসেবা বা মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই হল যে-কোন ধর্মের মূল উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্যও

অভিন্ন। মানুষের অভাব-অভিযোগের অবসান, সুখী-সমৃদ্ধ জীবনের নিরাপত্তা প্রদান, সামাজিক কল্যাণ সাধন প্রভৃতি রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজনীতির মুখ্য লক্ষ্য হল সত্যের উপলব্ধি। এই সত্য উপলব্ধি ঈশ্বর উপলব্ধির মাধ্যমে সম্ভব। গান্ধীজি সত্যানুসন্ধান ও সত্য উপলব্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সত্যানুসন্ধান ও সত্যোপলব্ধির উপায় হল ধর্ম। মানবসেবা এবং মানুষকে ভালবাসার মাধ্যমে সত্যানুসন্ধানের অভিব্যক্তি ঘটে। তেমনি অহিংসা ও ন্যায়ের পথেই সত্যোপলব্ধি সম্ভব।

ধর্ম ও রাজনীতির উদ্দেশ্য অভিন্ন

মহাত্মা গান্ধী গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক বন্ধন হিসাবে ধর্মকে তুলে ধরেছেন। ধর্মের সামাজিক উপযোগিতার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ন্যায়-সত্য এবং অহিংসা ও উদারতার উৎস হিসাবে তিনি ধর্মের কথা বলেছেন। আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম গান্ধীজির কাছে গুরুত্বহীন। ধর্ম ও রাজনীতির সংযোগ-সম্পর্ক বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে তিনি মৌলবাদী বা আনুষ্ঠানিক ধর্মানুসরণকে উপেক্ষা করেছেন। এই কারণে অধ্যাপক জোহারী (J. C. Johari) তাঁর *Principles of Modern Ploitical Science* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "We may comment that Gandhiji's approach to politics is in tune with the doctrine of enlightened secularism."

উপসংহার

৭.৪ গান্ধী : সাম্প্রতিক তাৎপর্য (Gandhi : Relevance Today)

গান্ধী সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব। তাঁর রাজনৈতিক মতামত, কর্মসূচী, আন্দোলন কোন পূর্বনির্দিষ্ট খাতে না যাবার দরুন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে তাঁর তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধরা পড়ে। তাঁর প্রাথমিক পরিচয় তিনি ব্রিটিশ শাসন বিরোধী অবিসংবাদী নেতা। এর পাশাপাশি তিনি নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভারতীয় পথিকৃৎ। পশ্চিমী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার তীব্র সমালোচক, শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় অপরাধের বিরুদ্ধে ন্যায়নীতিজ্ঞান সম্পন্ন অহিংস প্রতিরোধীর পক্ষে তাঁর অবস্থান। সহায় সম্বলহীন নিঃস্ব মানুষজনের তিনি প্রতিনিধি। গান্ধীর বহুমাত্রিকতা, তাঁর মতবাদ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিকগোষ্ঠীর সমালোচনা থেকে নানা বিতর্ক, সন্দেহরও সৃষ্টি হয়। যেমন 'প্রগতিশীল উন্নয়নবাদী'দের চোখে গান্ধী এক আদ্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি যিনি ইতিহাস প্রগতির বিরুদ্ধে অবস্থান করেন। রুশ পপুলিস্টদের মত তিনিও ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। অথচ আধুনিকায়ন, শিল্পোন্নয়নের অনিবার্যতা প্রতিনিয়ত এই ঐতিহ্যের জগতকে ধ্বংস করেই এগিয়ে চলে, মানবজাতির ক্রমপ্রগতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাস প্রগতির অনিবার্যতায় বিশ্বাসী মার্কসবাদীরা আবার ভিন্নভাবে গান্ধীর সমালোচনা করেন এইভাবে যে, তিনি ভারতীয় জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার অভীপ্সাকেই সহায়তা করেন। রজনী পাম দত্ত থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের সমস্ত ধারার মার্কসবাদী, সংসদীয় অথবা র‍্যাডিক্যাল সংসদ বিরোধী বিপ্লবপন্থী, আলোচনায় গান্ধীকে ভারতীয় উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে দেখা হয়। উপরন্তু এই সমস্ত ধারার মার্কসবাদীরাই গান্ধীর বিভিন্ন সামাজিক-নৈতিক বিষয়, যেমন, 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন' বা 'মদ্যপানের কুফল এবং এর অবসান' ঘটানোর উদ্যোগ ইত্যাদি নিয়ে অতিসক্রিয়তাকে এক ধরনের লক্ষ্যভ্রস্টতা বলে চিহ্নিত করেন। তাঁদের মূল সমালোচনা হচ্ছে এই যে এই সমস্ত সামাজিক-নৈতিক আন্দোলনগুলি ঔপনিবেশিকতা বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম বা শ্রেণী শোষণ / সংগ্রামের মূল লক্ষ থেকে সরিয়ে দেয় এবং অযথা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। বামতত্ত্ব নির্দেশিত 'সার্বিক সমাধানের' অবিসংবাদী এবং অমোঘ সূত্রগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে যে নিশ্চিন্ততা তা ব্যাহত করে এই সমস্ত 'অকিঞ্চিৎকর' ছোটখাটো স্থানীয় সমস্যাগুলি। তাই বামপন্থীদের পাশাপাশি স্বাধীনোত্তর ভারতে উন্নয়নবাদী রাষ্ট্রের ব্যাপক কর্মকাণ্ডের উদ্যোক্তা নেহেরু প্রমুখও গান্ধীর ভিন্ন ধরনের রাজনীতির গুরুত্ব একেবারেই স্বীকার করেন নি। গান্ধীর উপযোগিতা স্বাধীনোত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ থেকেছে রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে, রাষ্ট্রীয় প্রতীক হিসেবেই তিনি বিরাজমান।

অথচ বৃহত্তর সমাজজীবনে, জীবনচর্চায়, সামাজিক আন্দোলনে গান্ধীর ধ্যান-ধারণা, আন্দোলন পদ্ধতি নতুনভাবে অনুরণিত হচ্ছে সাম্প্রতিককালের ভারতবর্ষের নানাপ্রান্তে এবং বিশ্বের নানা দেশের এখানে ওখানে। মার্কসীয় অবস্থান থেকে অথবা প্রগতিবাদী এবং উন্নাসিক আধুনিকতার অনুগামীদের তরফ থেকে গান্ধীকে চটজলদি পশ্চাদ অভিমুখী এবং উন্নয়ন বিরোধী বলে প্রায় বাতিলের পথে ফেলা হয়। তিনি যেন ঐতিহ্য, প্রচলিত জীবনচর্চাকেই উন্নয়নের বিপক্ষে দাঁড় করান এবং প্রাচীন যা কিছু তা টিকিয়ে রাখতেই বদ্ধপরিকর। এই ধরনের অবস্থান আসলে গান্ধীচিন্তার জটিলতাকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ। ডেভিড হার্ডিম্যান তাঁর গান্ধী সংক্রান্ত সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে গান্ধী ভারতীয় সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন, সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর এই সমালোচক দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু তিনি গড়ে তুলেছেন আধুনিক ইউরোপের এনলাইটেনমেন্টজাত বিভিন্ন মূল্যবোধ, যেমন, মানবাধিকার, সামাজিক সাম্য এবং গণতন্ত্র ইত্যাদির সংস্পর্শে

এসে। আবার অন্যদিকে বিদেশী শাসনের অধীন ভারতবর্ষের তুলনায় পশ্চিমী সংস্কৃতি, জীবনযাপন যে শ্রেষ্ঠতর এবং অনুকরণীয় এই বিশ্বাসে তিনি আদৌ-আস্থাশীল ছিলেন না। এই ধারণার বিরুদ্ধে তিনি চিরায়ত ভারতীয় ধ্যান-ধারণার শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন। এই অবস্থান গড়ে তুলতে গিয়েও তিনি পশ্চিমী চিন্তাবিদ্‌দের অনেকের রচনা থেকেও প্রয়োজন মতো রশদ সংগ্রহ করেন। এই পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্‌দের অনেকেই প্রাধান্য বিস্তারকারী পশ্চিমী উন্নয়নবাদের কঠোর সমালোচক। এইভাবে গান্ধীচিন্তার মধ্যে নবনির্মিত দেশীয় ধ্যান-ধারণার জোরদার উপস্থিতির পাশাপাশি পাশ্চাত্য র‍্যাডিকাল চিন্তাবিদ্‌দেরও প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। রুশো, রাসকিন, টলস্টয় বা গান্ধীর সময়কালীন হেনরী বের্গসঁর প্রসঙ্গ এখানে চলে আসে। গান্ধীচিন্তার এক বড় অংশ জুড়েই রয়েছে এই সমস্ত ভিন্ন ধরনের পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের সঙ্গে ক্রমাগত বাক্যালাপ এবং মতামত আদানপ্রদান।

তাঁর ভারতীয় সমালোচকদের সঙ্গেও তিনি প্রতিনিয়ত আলোচনা, তর্কবিতর্ক, সংলাপে লিপ্ত হয়েছেন। মতৈক্যে পৌঁছানর চেষ্টা করেছেন এবং নিজস্ব চিন্তায় কোন খামতি থাকলে তা পূরণ করার চেষ্টা করেছেন এবং বিরোধী পক্ষের যুক্তি অনুযায়ী প্রয়োজনমত নিজেকে পরিবর্তনও করেছেন। আম্বেদকর, জয়প্রকাশ নারায়ন, রবীন্দ্রনাথ এবং প্রথম জীবনে গোঁড়া মার্কসবাদী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে তিনি সারা জীবনই তর্কবিতর্ক করেছেন। পারস্পরিক সংলাপ উভয়পক্ষকেই খানিকটা অবস্থান বদলাতে সাহায্য করে। মার্কসবাদী অবস্থান থেকে মানবেন্দ্রনাথ গান্ধীর চূড়ান্ত সমালোচনা করলেও পরবর্তীকালে তাঁর র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট পর্যায়ে অনেকটাই গান্ধীচিন্তার অনুরণন ঘটান। আবার গান্ধীও জীবনের শেষদিকে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা খানিকটা মেনে নেন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভিন্নপথও তিনি উচ্চারণ করেন।

গান্ধীর চিন্তাভাবনা, রচনা এবং ভিন্নভিন্ন বক্তব্য প্রচলিত রাষ্ট্রদার্শনিকদের মত কোন একক সংলাপ হয়ে ওঠেনি বা তাঁর চিন্তা কোন স্থির, নির্দিষ্ট রাজনীতি দর্শন প্রতিষ্ঠা করেনি। ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য—স্পষ্ট যথাযথ অনড় রাজনীতিদর্শন উপস্থাপনা—এর বিপরীতে গিয়ে গান্ধী বিবদমান উভয়পক্ষের যুক্তির উল্লেখের পাশাপাশি কার্যকরী সমাধান প্রস্তাবে উপনীত হবার চেষ্টা প্রতিনিয়ত করেন, উদ্দেশ্য উচ্চতর কোন সত্যের সন্ধান। এই ক্ষেত্রে তাঁর প্রেরণা সক্রেটিস অথবা প্লেটো। এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই তিনি রাজনীতির কোন মহাভাষ্য বা নির্দিষ্ট মতাদর্শ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর চিন্তাধারায় তাই রয়ে যায় নানা অসংগতি, গান্ধী নিজেই তা স্বীকার করেছেন। বিবদমান বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে প্রতিনিয়ত তর্ক-বিতর্ক, যুক্তি পাল্টাযুক্তির মধ্য দিয়ে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেখানে বলপ্রয়োগের কোন স্থান নেই। ঈশ্বরে তাঁর গভীর বিশ্বাস থাকলেও এবং 'সার্বজনিক সত্য' এবং ঈশ্বরকে তিনি অভিন্ন বলে মনে করলেও তাঁর মতে এই 'সত্য'কে সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করা অসম্ভব। বরং দৈনন্দিন জীবনে সত্য অন্বেষণ চলে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরিক্ষা, তর্ক-বিতর্ক, অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী সত্যের ধারণা পরিবর্তিত হয়। এখানে যুক্তি—পাল্টা যুক্তির, তর্ক—পাল্টা তর্কের মধ্যে মতের আদানপ্রদান চলে এবং এর মধ্য দিয়েই অনালোচিত ক্ষেত্রগুলি উন্মুক্ত হয়। এইভাবে গান্ধীর অবস্থান নির্দিষ্ট রাজনীতি তত্ত্ব ব্যবস্থার বিপরীতে। কার্যতঃ গান্ধীর রাজনীতি একধরনের মানসিক অবস্থান, যাবতীয় নির্যাতন শোষণের বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিবাদী মানসিকতা। স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে গান্ধী প্রদর্শিত আন্দোলন ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দলিত আন্দোলন, নারী আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন, উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এবং সমাজতত্ত্বে সাম্প্রতিককালে যে আন্দোলনগুলিকে 'নয়া সামাজিক আন্দোলন' বলা হয় তার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে ভারতে সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে যে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচী মূলতঃ প্রযুক্তিবিদদের উদ্যোগে গৃহীত, যা কার্যতঃ পুঁজিবাদী আগ্রাসন আর আধিপত্য বিস্তারের সহায়ক। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতের নানা জায়গায় গান্ধী নির্দেশিত আন্দোলন পদ্ধতি অনুসরণ করে একাধিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। মূলতঃ পরিবেশ আন্দোলন, কৃষিজমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বৃহদায়তন বাঁধ বিরোধী আন্দোলন, মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন সরাসরি গান্ধীর নানা রচনা এবং রাজনৈতিক অনুশীলনের অভিজ্ঞতার অনুসারী মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন ভারতে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে সাম্প্রতিক কালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অধ্যাপক উপেন্দ্র বক্সী মন্তব্য করেছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যাবতীয় রাজনৈতিক মতাদর্শের অবসান ঘটার ফলে মানবাধিকার আন্দোলন নতুন মতাদর্শ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং এই ক্ষেত্রে গান্ধীর চিন্তা এবং অনুশীলন পদ্ধতির তাৎপর্য সবচেয়ে বেশী।